NAAC Re-accredited 'A' Grade College

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

চলোর্মি

১৭ তম সংখ্যা ২০২৫

सत्यमेव जयते

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

'আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি।'

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into **Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic** and to secure to all its citizens:

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity;

and to promote among them all

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November 1949, do Hereby Adopt, Enact and Give to Ourselves this Constitution.

'মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা '

- স্বামী বিবেকানন্দ

ডেবরা থানা
শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
(স্বশাসিত)

চক্‌শ্যামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১২৪

চলোর্মি

১৭ তম সংখ্যা ২০২৫

প্রকাশনায়
ড. রূপা দাশগুপ্ত
প্রিন্সিপাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

পত্রিকা উপদেষ্টা মণ্ডলী
১। ড. রূপা দাশগুপ্ত
প্রিন্সিপাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
২। বিপাশা মজুমদার দে, অধ্যাপিকা
৩। ড. অর্পিতা ত্রিপাঠী, অধ্যাপিকা
৩। শ্রী সৈকত চক্রবর্তী, অধ্যাপক
৪। সেক সরফরাজ আলি, অধ্যাপক
৫। ড. পঙ্কজ কান্তি সরকার, অধ্যাপক
৬। কোয়েল ঘোষ, অধ্যাপিকা
৭। ড. বিপ্লব দত্ত, অধ্যাপক
৮। ড. গোবিন্দ দাস, অধ্যাপক

পত্রিকা সম্পাদক
অধ্যাপিকা কোয়েল ঘোষ
এবং
ড. উদয়ন ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৭ নভেম্বর, ২০০৮
সপ্তদশ প্রকাশ ঃ ১৭ নভেম্বর, ২০২৫

প্রচ্ছদ ভাবনা
ড. রূপা দাশগুপ্ত
প্রিন্সিপাল, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
প্রচ্ছদ রূপায়ণ এবং অলঙ্করণ
অরিজিৎ মান্না, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

Design & Printed by
Samaresh Sen, Mirzabazar, Midnapore
Mobile No.:- **7029106753**

১৭তম সংখ্যা ২০২৫

সূচিপত্র

অধ্যক্ষার কলমে	06
সম্পাদকীয়	07

কবিতা

জীবন	–	ড.রূপা দাশগুপ্ত	08
Haiku	–	Prof. Bipasha Majumder De	09
পড়ে আছে পথ	–	অধ্যাপক সৈকত চক্রবর্তী	09
পরিশ্রম	–	ড. মৃণাল কান্তি সরেন	10
সূর্যসাথী	–	ড. উদয়ন ভট্টাচার্য	11
প্রারম্ভ	–	ড.পথিক কুমার জানা	12
জীবনের সন্ধানে	–	অধ্যাপক দশরথ হালদার	12
অভুক্ত উৎসব	–	ড. বিশ্বনাথ দাস	13
স্মৃতির গভীরে	–	সোমা মিশ্র	14
সমাজ	–	সুদীপ্তা মাহাতো	14
মশা	–	সুকুমার টুডু	15
আমার মাতৃভাষা-সাঁওতালি	–	বর্ণালি টুডু	15
Glaring towards Flames	--	Gourab Maiti	16
আদর্শ অধ্যক্ষা	–	পায়েল মণ্ডল	17
নক্ষত্রের গুপ্ত সুর	–	আহির কাশ্যপ	17
এসেছে শরৎ	–	তাপস কুমার সামন্ত	18
বিষাক্ত প্রেম	–	সংগ্রাম মল্লিক	18
কমফোর্ট জোন	–	শিতারা পারভিন	19
কিছু কথা কিছু ব্যথা	–	পম্পা তুঙ	19
আরশি	–	সোহিনী চক্রবর্তী	20
মূল্য	–	পায়েল ঘোষ	20
প্রকৃতি	–	লাবনী ভঞ্জ	21
বীরঙ্গনা মাতঙ্গিনী	–	তনুশ্রী রায়	21
পাগলা হাতি	–	আকাশ মুখার্জ্জী	22
বন্ধু	–	চণ্ডী মাহাত	22
স্বপ্নের পথে	–	সোমনাথ চক্রবর্তী	23
বিষণ্ণতা	–	মন্দিরা খামরই	23
নিরুপায় নারী	–	নবনীতা পাত্র	24
সময়ের স্রোত	–	পিউ ভৌমিক	24
রেল	–	শিবনাথ সিং	25
একটু ভাবো	–	সঙ্গীতা মিশ্র	25
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি	–	রঘুনাথ সিং	26
মনের কথা	–	রাজকুমার ভৌমিক	26
ঋতুরাজ বসন্ত	–	জয়শ্রী মণ্ডল	27
Digital	–	পিকু দোলই	27
মায়া প্রলয়	–	আহির কাশ্যপ	28
নারীর সংগ্রাম	–	সৌমি দত্ত	28
লাঠির আঘাতে	–	পল্লব গুছাইত	29
তোমার মেয়ে	–	মল্লিকা দাসমাল	29
অনুভূতি	–	স্বর্ণিকা দে	30
শুকতারা	–	ইয়াসমিন খাতুন	30
ভালোবাসার সংবিধান	–	সৌম্য শীট	30
আমার স্বপ্ন	–	নেহা পারভিন	31
জগৎমাতা	–	সেক মুস্তাফিজুর রহমান	31
মহাশক্তির দুই রূপ	–	পল্লব গুছাইত	32
স্বপ্নময় রজনী	–	পাপিয়া খাতুন	32
ভারতবর্ষ	–	সুকুমার টুডু	33
বাঁচার লড়াই	–	চন্দনা সিং	33
ছন্দ	–	প্রীতম ধল	34
আমার লেখা কবিতা	–	মৌমিতা চক্রবর্তী	34
কালের বিচার	–	সংগ্রাম মল্লিক	35
প্রকৃত বন্ধু	–	প্রীতম ধল	35
জীবনের গান	–	কুহেলি মুখার্জি	36
অভিমান	–	সেজুতি মিশ্র	37
বর্ষার বিকেল	–	রিফা রাফিয়া	37
The Rainfall	--	Bikram Shit	37
The End That Stays	--	Koustab Kanti Maiti	38
The Hands That	--	Subhajit Singh	39
The Sun and Our	--	Paramita Sasmal	40

প্রবন্ধ

যাদের ইতিহাস হারিয়ে	–	ড. শত্রুঘ্ন কাহার	41
স্বপ্ন দেখার সাহস	–	ড. গোবিন্দ দাস	45
মনসাপুজো ও কিছু কথা	–	অধ্যাপক অভিষেক মুসিব	47
মূল্যবোধহীন শিক্ষা	–	গোপাল সেনাপতি	49
Honking Horns	--	Bholanath Das	51
Children of Earth	--	Soumya Chakraborty	52
হাঁড়িয়া	–	লক্ষ্মীকান্ত টুডু	61
প্রেমেন্দ্র মিত্রের মশা	–	অরিজিৎ মান্না	63
স্বামী বিবেকানন্দ	–	সুব্রত গোস্বামী	68
মানবতার নামে বিদ্রোহ	–	অভিষেক আশ	69
ডায়াবেটিস	–	জাসমিন আহমেদ	74
ড্যামসেলফ্লাই	–	ড.পথিক কুমার জানা	76

গল্প

দেবী পক্ষ	–	অধ্যাপিকা কোয়েল ঘোষ	78
পূর্বপুরুষ	–	ড. অর্পিতা ত্রিপাঠি	81
ডাওহিল স্টেশনের যাত্রী	–	ড. মিঠুন ব্যানার্জ্জী	83
জামাতা-পূজা	–	গৌরব মাইতি	86

অন্যান্য

200 বছর পরে ডেবরা কলেজ	–	ড. সৌম্যকান্তি হোতা	88
গরীবের লকডাউন	–	পায়েল ঘোষ	89
নষ্টনীড়	–	আগমণী পণ্ডা	92
বাঁকুড়া জেলার পরিচয়	–	অধ্যাপক অভিষেক মুসিব	93
একটি গাছের আত্মকথা	–	সৌমি দত্ত	94
দুর্নীতি	–	সুব্রত গোস্বামী	95
বাবা	–	পার্থ অধিকারী	96
We are Gen-Z	--	Aksha Afrin	96
কলম	–	শিবনাথ সিং	97
স্বাধীনতার একটা দিক	–	গোপাল প্রধান ও প্রসেনজিৎ ভূঞ্যা	97
নিজস্ব একটা রোমহর্ষক	–	পদ্মভূষণ ভূঞ্যা	98
রাসায়নিকের প্রভাবে	–	মিতালী রাউল	99
শিক্ষা	–	পরমানন্দ আচার	100
কলেজের প্রথম দিন	–	সংযুক্তা সিং	101
বেকারত্ব	–	পুতুল পাঁজা	102
ছাদবাগান	–	সহেলি সামন্ত	102
বিজ্ঞানের বিশ্বমঞ্চে ভারতবর্ষ	–	আত্মদীপ ভট্টাচার্য	103
হায়রে রাজনীতি	–	আনন্দ মল্লিক	104

চিত্রকলা ও আলোকচিত্র (105-112) : সুজাতা ভৌমিক, ঈপ্সিতা সামুই, দিশা মোদক, কৃষ্ণেন্দু সিং, বর্ষণ কোটাল, হানিফা খাতুন, সৌমেন হাইত, মুজাহিদ চৌধুরী, সৌমেন হাইত, হানিফা খাতুন, অদিতি মণ্ডল, সত্যজিৎ মুর্মু, শ্রেয়া ধল ও পূজা চন্দ।

অধ্যক্ষার কলমে

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের 'চলোর্মি' একটি সৃজনধর্মী ও মননশীল পত্রিকা। পত্রিকাটিতে বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক মনের সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনশীল সামাজিক মননের বর্ণময় প্রকাশ ঘটে। এবারের চলোর্মি তে সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীদের যূথবদ্ধ বৈচিত্র্যময় প্রতিভাদীপ্ত ব্যাতিক্রমী বলিষ্ঠ কলম, যেভাবে 'চলোর্মি'-র পাতায় পাতায় প্রাণ সঞ্জীবিত করেছে, তার জন্য আমি অত্যান্ত আনন্দিত এবং একই সঙ্গে গর্বিত। আশাকরি, এই নবীন প্রতিভা বিশ্বের বৃহত্তর আঙিনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করে মহাবিদ্যালয়ের এবং নিজেদের মুখ উজ্জ্বল আলোকমালায় রাঙিয়ে তুলবে। 'চলোর্মি'-র এই সপ্তদশ সংখ্যা মহাবিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা চিন্তাভাবনা - প্রযত্ন, বিশ্বাস-মূল্যবোধ-সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকার বহন করে, প্রতি বছরের মতো মহাবিদ্যালয়ের শুভজন্মদিনে নবরূপে, নবকলেবরে প্রকাশিত হল।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ডেবরা ব্লকের একমাত্র সরকারী সহায্যপ্রাপ্ত ডিগ্রী কলেজ যা এখানকার স্থানীয় মানুষের উৎসাহে ও সহযোগিতায় একদিন গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণে আমরা দায়বদ্ধ। বিগত এক বছরে এই দায়িত্ব পালনে আমাদের মহাবিদ্যালয় সদা সচেষ্ট থেকেছে। এই বছৰ আমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত রিসার্চ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। আগামীদিনে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন রকমের গবেষণা ও ছাত্রছাত্রীদের পি.এইচ.ডি.-র কাজ করাতে পারবো। এছাড়াও ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স টেকনোলজি ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে আমাদের পুষ্টি বিভাগ পেয়েছে Boost Grant। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অগ্রণী কলেজ হিসাবে উচ্চশিক্ষা দপ্তর আমাদের কলেজকে Hub কলেজের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা বাদেও খেলাধুলো ও অন্যান্য সাংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে ও প্রতিযোগিতায় তাদের ছাপ রেখেছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেমেয়েরা চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স আপ হয়েছে।

শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট এগিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতার পেছনে রয়েছেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ — একথা অকপটে স্বীকার করতেই হয়। অভিভাবক এবং স্থানীয় মানুষ যথেষ্ট সহযোগী মনোভাব দেখিয়ে কলেজের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইল নিরন্তর শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং উন্নত মানুষ হয়ে উঠুক এই আশা রাখি। সকলের সহযোগিতায় 'চলোর্মি' নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলুক। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ড. রূপা দাশগুপ্ত
অধ্যক্ষ
ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

সম্পাদকীয়

তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে 'অফুরান প্রাণ', স্বপ্ন, শক্তি, সাহস ও সম্ভাবনার অনন্ত সম্ভার। তরুণদের চিন্তা - চেতনা - দায়িত্ববোধের ওপর নির্ভর করে সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র এমনকি একটা সমগ্র জাতি। আমাদের 'চলোর্মি' তরুণ সমাজের মুখপত্র। তরুণ সমাজের নতুন ভাবনাচিন্তার আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সাহিত্যিক উদ্ভাবন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে 'চলোর্মি' সর্বদা স্বাগত জানায়। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজন্মের প্রতিনিধিরা সাহিত্যকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে সচেষ্ট। তাদের নতুন ধরণের লেখনিতে যুক্ত হয়েছে নতুন রূপের ভাষা, থিম, রীতি, আঙ্গিক এবং ব্যঞ্জনাময় আরও অনেক কিছু। 'চলোর্মি'-র এই সপ্তদশ সংখ্যাতে তাদের অনন্য সাহিত্যপ্রীতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই নবীন তরুণ সাহিত্যিকদের ভবিষ্যৎ জীবনের সার্বিক সাফল্য আমরা কামনা করি।

চলোর্মির এই সংকলনে যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ ও মননশীল করেছেন তাঁদেরকে প্রথমেই আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । অনেকেই হয়তো বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই পত্রিকায় সময়মতো লেখা পাঠাতে পারেননি, অথবা সাময়িক সময়াভাবে কিছু লেখা সংকলনে স্থান পায়নি, আমরা চেষ্টা করব এই শূণ্যস্থান পূরণ করে পরবর্তী সময়ে তাঁদের মূল্যবান ভাবনাচিন্তাগুলোকে গ্রন্থিত করে তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে আরও উজ্জ্বল করার।

পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড. রূপা দাশগুপ্ত মহাশয়ার কাছে। তিনি আমাদেরকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পত্রিকা সম্পাদনায় সাহস ও উৎসাহ দিয়েছেন এবং যথাযথ পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে উদ্দীপিত করেছেন। পত্রিকা কমিটির সকল সদস্য, মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং আমাদের স্নেহের ছাত্র-ছাত্রী সকলকেই জানাই আমাদের আন্তরিক, হার্দিক অভিনন্দন। আপনাদের ভালোলাগা ও ভালোবাসার সহচর্যে আগামী দিনে এই পত্রিকাটি একটি উন্নতমানের মননশীল ও সমৃদ্ধশালী পত্রিকা হয়ে উঠবে এ বিষয়ে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি যদি পাঠক-পাঠিকাদের মন সমৃদ্ধ করে এবং নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে তবে আমাদের এই স্বল্প প্রয়াস পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে। পত্রিকার ভুলত্রুটির জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যে কোনো পরামর্শ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়ে পরবর্তীকালে নির্ভুল পত্রিকা প্রকাশে আমরা অবশ্যই সচেষ্ট হবো — সবার কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।

ধন্যবাদান্তে

অধ্যাপিকা কোয়েল ঘোষ

ও

ড. উদয়ন ভট্টাচার্য

পত্রিকা সম্পাদক

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি

মহাবিদ্যালয়।

জীবন

ড. রূপা দাশগুপ্ত
অধ্যক্ষা, ডেবরা কলেজ

জীবন যেরকম
জীবনকে যেরকম চাইলাম
জীবনকে যেরকম পেয়েছি,
যেভাবে এত পথ পেরিয়ে
জীবনের ওঠাপড়া দেখেছি।
যে কথা কবিতার ছন্দে
লেখা গেল না আর কিছুতেই,
যে কথা মনের দ্বন্দ্বে
বলা গেল না আর কিছুতেই।
যা কিছু পাওয়ার ইচ্ছায়
মন আমার বারে বারে মেতেছে,
পাওয়া আর না পাওয়ার হিসেবে
সময় নিজের মত কেটেছে।
জীবনের যত রঙ যত স্বাদ
হয়ে যায় মিলে মিশে একাকার,
নিজেরই আওয়াজ যেন মনে হয়
নিজেরই কানে আসে বারবার।
কোথাকার কোন এক ছোট ভুল
বিশাল ফাঁকি হয়ে থেকেছে
প্রাপ্তির হিসাবটা হারিয়ে
না পাওয়াই শুধু রয়ে গিয়েছে।
সময়ের সাথে সাথে তাই তো
হিসাবের পাতা ছিঁড়ে ফেলেছি
জীবনের সব রং সাথে নিয়ে
জীবনকে আমি ভালোবেসেছি।

HAIKU

Bipasha Majumder (De)
Associate Professor & Head
Department of English

1
dewy dawn
the wind licking up
the night

2
drone attack
his unspoken words
lying buried

3
ancestral home
the wooden chair sloughs off
father's memories

4
frosty night
his silent drum beats
sound loud today

5
rain-drenched morning
a taro leaf wearing
a diamond necklace

6
earthworms . . .
gender conflicts cease
to exist*

* This haiku was nominated
for the Touchstone Award 2024.

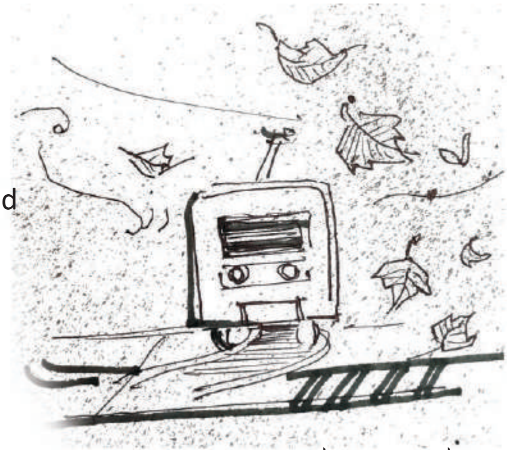

পড়ে আছে পথ

সৈকত চক্রবর্তী
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ

পড়ে আছে পথ, তোমার আমার যাওয়া
হয়নি, শুধুই পাতা ঝরে পড়ে শীতে
ফাল্গুন যায়, ঘোরে চৈত্রের হাওয়া
বলিরেখা বাড়ে কাচ-ভাঙা আরশিতে

পড়ে আছে পথ, আমাদের যাওয়া বাকি
উড়ে যায় ধুলো, জমে ওঠে বিদ্যুৎ
কলেজ ফেরত আসে কালবৈশাখী
গ্রীষ্মছুটিতে মৌসুমী মেঘদূত

পড়ে আছে পথ যাওয়া না যাওয়ার বাঁকে
বাইশে শ্রাবণ পেরিয়ে কিছুটা দূর
আশ্বিন নীল ফেরারি মেঘের ফাঁকে
শহর যদিও ভাদ্দুরে রোদ্দুর

পড়ে আছে পথ, পড়ে আছে, পড়ে আছে . . .
জেব্রা ক্রসিঙে রোজকার সাদা-কালো
অঘ্রান-ভোরে রাসবিহারীর কাছে
কুয়াশা পেরোয় প্রথম ট্রামের আলো

পড়ে আছে পথ, তোমার আমার যাওয়া
বাকি থেকে গেল, সেই কথা বলে দিতে
মরশুম থেকে মরশুমে ঘোরে হাওয়া
বলিরেখা বাড়ে কাচ-ভাঙা আরশিতে।

পরিশ্রম

ড. মৃণাল কান্তি সরেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

যদি থাকতে চাও ভালো।
কর্ম করে যাও, জীবনে আসবে আলো।।
সবাই তো ভালো কিছু চায়।
শ্রম বিনা সুফল পাওয়ার, কোনো সম্ভাবনা নাই।।
বড় হওয়ার স্বপ্ন আছে অনেকের মনে।
কুঁড়েমি করলে, লক্ষ্য পূরণ হবে না জীবনে।।
‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ ইহা সকলের জানা।
কর্মে যুক্ত রহো, চিন্তা করতে করছি মানা।।
একদা অনেকে ছিল নিতান্তই দীন।
কর্মে লিপ্ত থেকে, তাদের ফিরছে সুদিন।।
অনেকে আছে যারা একদিন ছিল ধনী।
বিলাসিতা আর অলসতায়, তারা হয়ে গেছে ঋণী।।

ছাত্র জীবনে করো মনোযোগে লেখাপড়া।
সুফল পেতে পেতে মন হবে, তেজস্বী ঘোড়া।।
পড়াশোনা করেও যদি না জোটে চাকরী।
সুদৃঢ় করো মন, ভেবো না যে, তুমি ভিখারী।।
চাকরী ছাড়াও অনেকে বিবিধ পেশায় কর্মরত।
শিক্ষা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে, তুমিও হবে প্রতিষ্ঠিত।।
যারা নিজের প্রতি আস্থা না রেখে, করে হায় হায়।
পিছিয়ে পড়বে তারা, সুস্থ সমাজে তাদের স্থান নাই।।
তাই কর্মে কর্মে রেখো নিজেকে নিয়োজিত।
জীবনের সব বাধা দূর করে, তুমিও হবে বিজিত।।
কর্ম বিনা হবে না অর্থ উপার্জন।
অর্থ না থাকলে দুর্বল হবে, তোমার মন।
একদা ধরা ছিল বসবাসের অযোগ্য।
শ্রমিকের শ্রমে, হয়েছে তা বাসযোগ্য।।
নানাবিধ কর্ম আছে, কর্মের নেই শেষ।
কোনো কর্মই ছোটো নয়, সব কর্মই বেশ।।
কেউ কখনো করো না শ্রমিককে অবহেলা।
শ্রম না দিলে শ্রমিক, খাবার জুটবে না দুবেলা।।
মোরা বিবিধ কর্ম, বিবিধ জনে করি।
উচ্চ পদে থেকে কেউ হইও না অহংকারী।
শ্রমিকের শ্রমে দেশ ও দশের উন্নতি।
শ্রম ছাড়া থেমে যাবে জীবনের গতি।।
বিবিধ কর্মীর কর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তার লক্ষ্য হয় পরিপূর্ণ।
কর্মীগণ কর্মে ফাঁকি দিলে তাঁর স্বপ্ন হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ।।

অলস জীবনে ধরে নানাবিধ রোগ।
ব্যাধিতে পড়তে থাকলে হবে না জীবন উপভোগ।।
কর্মময় জীবনে শরীর-স্বাস্থ্য-মন থাকে ভালো।
‘স্বাস্থ্যই সম্পদ’ ইহাই জীবনের আলো।।
তবে সব কিছুরই একটি মাত্রা থাকা চাই।
অধিক শ্রমও শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নাই।।
নিজ নিজ কর্ম যদি সঠিকভাবে পালন করি।
সবাই খুশি হবে তাতে, খুশি হবে হরি।।
পরিশ্রমে কেবল তোমারই নয় উন্নতি।
সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে, বাড়বে সভ্যতার গতি।।
‘কর্মই ধর্ম’ ইহা গীতার বাণী।
কর্ম করে যাও ‘কর্মই সব কিছু পাওয়ার জননী।।

সূর্যসাথী

ড.উদয়ন ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ

(সম্মাননীয় অধ্যক্ষা ড.রূপা দাশগুপ্ত-র কর্মদৃপ্ত জীবন ও আমাদের কলেজের সার্বিক উন্নয়নে নিজের স্বাচ্ছন্দ এবং প্রতিষ্ঠার সুযোগকে উপেক্ষা করে মেদিনীপুরের মাটির প্রতি ভালোবাসার টানকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় আমরা বিমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ।

এই কবিতা তাঁরই উদ্দেশ্যে লেখা; তাঁকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ছোট্ট কবিতাটি উৎসর্গ করলাম।)

ভালোবেসে বার বার কি ফিরে আসা যায় ?
মাটির সুগন্ধে বকুলের তলায়!
নির্জনে স্বজনের অণ্বেষায় – আরও প্রত্যাশায়!
যদি বা হয়ে উঠি সবুজ বুনো ঘাস, কিংবা অনন্ত আকাশ, বারোমাস ?
অতলান্ত সাগরের দিকে ছুটে চলি যদি
যোগ-বিয়োগ, শূণ্য-সহস্র, হারিয়ে যায় যদি লাভ-ক্ষতি!

হয়তো লোনা জল মেশে আমার সুমিষ্ট-স্বচ্ছ জলের সাথে
বনানী ঘেরা ঘন সবুজ দ্বীপে, অপেক্ষায় জ্বলে ওঠে আকাশ প্রদীপ
আমার অভিমানী অন্তঃস্রোতের অভিমুখে, প্রহর শেষের রাঙানো আলো পড়ে এসে
অনাসক্ত সময় - নিরপেক্ষ আশ্রয় - নিষ্কলঙ্ক বাতাসের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক নীরবতা
উন্মত্ত অশ্বত্থের নির্মোহ স্বাধীনতা আমার জন্য নিয়ে আসে আরও, আরও শীতলতা
বাঁকে ঘেরা উপকূল মায়াবী সোনালী বালি, বুকের মাঝে জমা রাখে উতুঙ্গ উর্বরতা!

আগুন শিমূল আর তরমুজের লতা অপদার্থ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে
কাঠ পিঁপড়ের দল আদুরে বিষ ঢেলে দিয়ে যায় আমার অনাবৃত আংশিক শরীরে
পশুরাজের গন্ধ মেখে যে গাছটি বর্বরের মতো নৃত্য করে,
সে যখন ঝুঁকিয়ে দেয় ফুলবৃন্তহীন শাখা আমার চোখে
সেই সন্ধিক্ষণে আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে, আমার মনের বন্ধ খামে, ভেজা লেবুর গন্ধ জমে
বর্ষাধারা আত্মহারা শরীর জুড়ে ঘুরে ঘুরে নামতে থাকে মাতিয়ে দিয়ে।
রাঙানো মনের স্বপ্ন ব্যথা – হারিয়ে দিয়ে পূর্ব কথা
ফিরতে চায় কী পিছুটানে ...
কিন্তু ভরা চোখে তাকিয়ে দেখি – এ কী ?
একা আমি দাঁড়িয়ে আছি নদীর পাড়ে – নদী হয়ে, সূর্যসাথী।

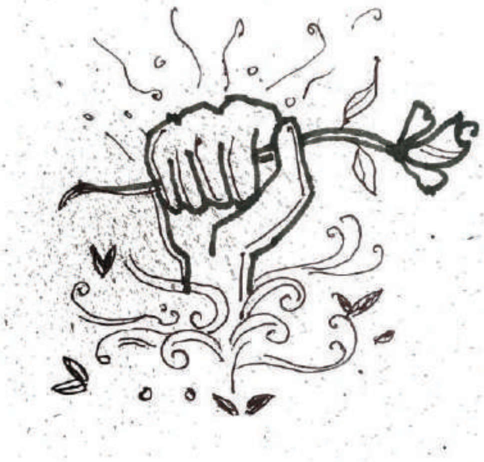

প্রারম্ভ

ড. পথিক কুমার জানা
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

জানি না কিভাবে কেউ কথা রাখে;
কিভাবে কেউ অন্তর ছুঁয়ে যায়।
আমি তো দরদীর ব্যথাই বুঝি না -
জানি না কেউ কিভাবে দু'হাতে স্বপ্ন জোড়া দেয়।

জানি না কিভাবে কেউ হৃদয় জুড়ে ঠাঁই পায়;
কিভাবে কেউ স্বপ্নে এসে রোজ রাতে হাত ধরে।
আদর দিয়ে বুকের মাঝে কেউ
কিভাবে সারা জীবন ভালোবাসায় ঘর বাঁধে।

জানি না কিভাবে কেউ নীরবতায় গান বুনে;
কিভাবে কেউ হাত বাড়িয়ে জীবন ছুঁয়ে প্রাণ আনে
আমিও বিলিয়ে দেবো আজ নিজেকে ঐ পথে।
জানতে হবে কিভাবে কেউ অমন রসে রাস রচে
আমিও জেনো বাসবো ভালো
সাত সমুদ্র-তেরো নদী এক করে।
সোহাগী তোমায় রাখবো সুখী
রাখবো হৃদয় অন্তরে।

জীবনের সন্ধানে

দশরথ হালদার
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

মন যদি চায় উড়তে আজি
দাও না ছেড়ে উড়ুক আজ।
আটকে রেখে লাভ কি হবে
পড়ছে বা কার মাথায় বাজ।

উড়ছে উড়ুক ঝরছে ঝরুক
ভাঙছে বাঁধন খুলছে আজ।
তাই না দেখে সভ্য সমাজ
ঢাকছে যে মুখ, পাচ্ছে তো লাজ।

লজ্জা তাদের ঘুচিয়ে দাও
মুখোশধারী চরিত্রদের
মুখগুলি সব চিনিয়ে দাও।
মুখোশপরা মুখোশধারী
ওদের তোমরা শিক্ষা দাও।
চলার পথে বাধাগুলো
বিষম-ঝড়ে উড়িয়ে দাও।
জীবন মানে -
ভুলের ব্যাখ্যা বন্যা আজ
জীবন মানে - সভ্য ব্যাখ্যা
ওরা সবাই, ভুলছে আজ।

আজকে তোমারা, এগিয়ে যাও।
জীবন মানে বুঝিয়ে দাও।
জীবন মানে - - -
'ফুলের ফসল, আলোর জোয়ার'।
জীবন মানে - - - 'নিঃস্ব' নয়।

অভুক্ত উৎসব

ড. বিশ্বনাথ দাস
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শঙ্খ ধ্বনিতে মুখর বাড়িঘর, কাঁসর বাজে সাঁঝবেলা,
দুর্গা মায়ের পুজো আসে, আলো, আনন্দোচ্ছ্বাস, মিষ্টি সাথে।
প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মানুষের ঢল, আলোয় ঝলমলে দিন,
কিন্তু আমাদের ঘরে নেই সেদিন একমুঠোও চাল, নুন-হীন।

অষ্টমীর দিন সূর্য উঠল, খালি হাঁড়ি চেয়ে চেয়ে,
মা বলল, ''আজও হয়নি কিছু'', চোখে জল লুকিয়ে নিয়ে।
বাবার মুখে নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস, পকেটে ফাঁকা বাতাস,
পাশের বাড়িতে লুচি – পায়েসের গন্ধ, আমাদের কেবল হাহাকার।

পুজোর ধুনুচি নাচ, আরতির ঝংকার,
আমরা শুধু জানালার ফাঁকে তাকাই বারবার।
মায়ের প্রতিমা হাসে, গয়নায় ভরা,
আমাদের মা চোখের জলে ভেজা, পোশাক ছেঁড়া।

কে বলেছে পুজো সবার ? এই আনন্দ কি সবারই হয় ?
আমাদের ভাগ্যে কেন শুধু ক্ষুধা আর অবহেলা ?
কেন মা দুর্গা শুধু মণ্ডপে থাকেন ? আসেন না ঘরে ঘরে ?
অষ্টমীর দিনেও কেন আমরা থাকি এই দারিদ্র্যের ছায়াতলে ?

তবু মনে করি, একদিন আসবে আলো,
আমার মা, ভাই-বোন পাবে পেট ভরে অন্ন।
তখম পুজো হবে শুধু সাজে নয়,
মানুষের পাশে, হৃদয়ে হৃদয়ে – নতুন প্রয়াসে, নতুন ভাবে
এই রইলো মনে আশা।

স্মৃতির গভীরে

সোমা মিশ্র
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

স্মৃতির গহ্বরে আজও লুকিয়ে আছে
তোমার নীরব উপস্থিতি –
যেন অতীতের গভীর আলো
নিঃশব্দে ছুঁয়ে যায় আমার হৃদয়।
ভুলতে চাইলে আরও
স্পষ্ট হয়ে ওঠো তুমি,
সময়ের অনন্ত গহনে
প্রতিধ্বনিত কোনো ডাক -
যেন আমায় পথ দেখায়।
তোমার এক টুকরো ছায়া
এখনো মন ভরিয়ে রাখে,
আর আমার নীরব রাতগুলোতে
তুমি হয়ে আছো –
অল্প আলো, গভীর স্মৃতি,
আর অমোচনীয় অনুভব।

সমাজ

সুদীপ্তা মাহাত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

রাস্তাগুলো এখনও ভরে থাকে মানুষে,
তবুও কোথাও যেন মানুষ নেই।
চোখে আলো, মুখে কথা, অন্তরে গভীর কুয়াশা —
যেন সভ্যতার ভেতর জমেছে নীরব অন্ধকার।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই,
সেখানে কেবল পর্দার প্রতিবিম্ব,
সত্যের নয়, মুখোশের আলোতে আলোকিত শহর।
ভালোবাসা এখন ঘোষনীয় শব্দ,
সহানুভূতি — কেবল এক ক্লান্ত ধারণা।
বাজারে বিক্রি হয় বিবেক,
শিরোনামে সাজানো থাকে ক্ষত,
আমরা করতালি দিই —
যেন প্রতিটি ধ্বংসই বিনোদনের দৃশ্য।

ধর্ম আজ ভয়ের মুখোশ পরে এসেছে,
রাজনীতি জাগিয়েছে ঘুমন্ত পশুত্ব,
মানুষ ভাগ হয়ে গেছে বিশ্বাসের রঙে —
কেউই বুঝতে চায় না,
রক্তের রঙ সবারই এক।
শিশুরা বড় হয় ইতিহাস ভুলে,
তারা জানে না স্বপ্ন কী,
সমাজের দেয়ালে এখন অসংখ্য ফাটল,
তার ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে মিথ্যা।

তবু কোথাও, কোনো মাটির গন্ধে,
হয়তো এখনও লুকিয়ে আছে এক বীজ —
যে বীজের নাম বিশ্বাস,
যে জন্ম নিতে চায় মানুষের ভেতরেই।

মশা

সুকুমার টুডু
অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ

মশা আমার নাম
রক্ত খাওয়া আমার পেশা
জন্ম আমার ড্রেন জলাশয়ে
বুদ্ধি থাকে ব্রেনে।
পড়ার সময় মশার কামড়
ভীষণ এ কি জ্বালা
ভোঁ ভোঁ করিস কানের কাছে
জীবনের এ কি জ্বালা
যতই বলি ক্ষমা করে দে ভাই
পায়ে তোমায় পড়ি
পা ছাড়িয়ে মশা বলে,
I am very sorry
আমার কাছ থেকে রেহাই পেতে হলে
good night জ্বালাও তবে
যাচ্ছো ঘুমের ঘোরে
মশারি টাঙাও তবে।

আমার মাতৃভাষা -সাঁওতালি

বর্ণালী টুডু
অধ্যাপিকা, সাঁওতালি বিভাগ

'হপন মৌয় বলে ডাকত মা
হ্যাঁ য়ু বলে দিতাম আমি সাড়া,
আমার ভাষা বুঝতে পাখি নদী
সবুজ বন আর নদীর ঢেউয়ে।
শুনেছি আমি মায়ের মুখে
প্রথম মাতৃভাষা সাঁওতালি
খেলতে খেলতে সকাল সন্ধ্যা
শিখেছিলাম (ᱚ)অ(ᱛ)অত(ᱜ)অঃ(ᱝ)অং(ᱞ)অল।
মায়ের মুখে শোনা সাঁওতালি গান
পাহাড় হাওয়ার মতো নির্মম খাঁটি
ছিল না ইংরেজি, হিন্দি কিংবা বাংলা
ছিল শুধু হৃদয় ভরা সাঁওতালি সুর।
সাঁওতালি মানে মায়ের কোল
নাচে গানে উলোনে হৃদয়
পল্লী পথের ধুলো মাখা ভাষা
তবু তাতে আছে গর্বের পরিচয়।
মায়ের ভাষা প্রাণের ধনী
এই শহের ব্যস্ত স্রোতে
আধুনিক সভ্যতার চাপে
ভাষা কি তবে হারাবে ?
তাই আমি কলম তুলে নিই
লিখে সাঁওতালি ভাষার জন্য
ভাষা হারালে মানুষ হারায়
সংস্কৃতি, স্মৃতি, ভালোবাসা হারায়।
আমার মাতৃভাষা আমার পরিচয়
বাঁচাবো তাকে প্রাণ দিয়ে
অলচিকির অক্ষরে আবার
ভরে তুলব আকাশ, বাতাস, কাগজ হৃদয়ে।

Glaring Towards Flames

Gourab Maiti
Faculty, Department of Computer Science

(In the remembrance of our beloved student Late Rohit Basak)

I stand before your empty chair,
The silence thick, too much to bear.
Your notes lie still, your desk untouched,
A space once filled with dreams in hutch.
You questioned stars, you chased the sky,
With eager heart and wondering eye.
Each answer sparked a deeper quest,
You never settled, gave your best.
The world to you was one vast page,
To read, to learn, to gently gaze.
A mind so rare, a soul so kind -
You truly left a void behind.
I watched you grow in thought and grace,
In every class, you found your place.
You lifted words and numbers too,
With joy that only few pursue.
But now the classes are dim and gray,
Since fate has cruelly snatched you away.
No warning came, no final bell,
Just echoes of the tales you'd tell.
I'll miss the light you brought each day,
The quiet strength, the cheerful way.
You were not just a pupil here -
You were a future held so dear.
My heart still teaches with your name,
Your spark survives beyond the flame.
The Memories carried through mind's cart -
Will remain forever in my heart.

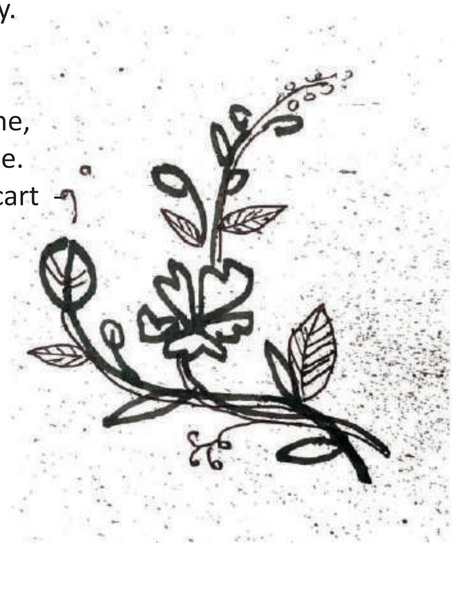

আদর্শ অধ্যক্ষা

পায়েল মণ্ডল
বি.এস.সি. জেনারেল

অধ্যক্ষার আসনেও যিনি মমতাময়ী ছায়া
ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বাঁচেন, খুঁজে পান জীবনের মায়া।
আকাশের কাছে মাটি যেমন ধরার ধরিত্রী
স্নেহের ছায়ায় আগলে রাখেন শিক্ষার ভুবনটি।
নিজেকে ভুলে ভাবেন তিনি সবার ভবিষ্যতের কথা
সম্মান দিয়ে গড়ে তোলেন ভালোবাসার আস্থা।
বট বৃক্ষের মতোই তিনি রয়েছেন ছায়া দিয়ে
অহংকারহীন মমতায় মিশে থাকেন প্রতিটি টানে।
উচ্চপদ মর্যাদায় থেকেও, হৃদয় রাখেন মাটির কাছে
সবার প্রতি সমান সম্মান, স্নেহের বাঁধন আঁচে।
পড়াশোনার সাথে সাথে অনেকরকম শিক্ষা দিয়ে
সুযোগ এনে দিয়েছেন প্রতিটি শিক্ষার্থীদের জীবনে।
অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা
দিশাহীন ছাত্রছাত্রীদের পথপ্রদর্শিকা
অগণিত শিক্ষার্থীদের কাণ্ডারী।
"অধ্যক্ষা ম্যাডাম সবার সেরা যার নেইকো তুলনা
আদর্শবান আমাদের ম্যাডাম লক্ষে একজন।"

নক্ষত্রের গুপ্ত সুর

আহির কাশ্যপ
জুলজি বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

বিশাখার নক্ষত্রে
বীণার তারে জাগে সুপ্ত আগুন
প্রতি ঝংকারে জেগে ওঠে
অজানা শরীরের ভাষা।

পূর্ণিমার মুক্ত আকাশ
শ্বেতপদ্ম ভাসে ব্রহ্ম সরোবরে
তার পাঁপড়িতে কামনার আভাস
তবুও সুগন্ধে লুকোনো মুক্তি

চোখে দ্ব্যার্থের দীপ
প্রেম না প্রলোভন ?
একাকীত্বে নদী ভেসে যায়
কূল খুঁজে ফেলে অনন্ত।

হঠাৎ অনুরাধা নক্ষত্র
আকাশে তার পদ্মের আসন
বীণার সুরে নীরব নিবেদন
যেখানে প্রেম আর মুক্তি
একই আলোতে মিলেমিশে যায়।

এসেছে শরৎ

তাপস কুমার সামন্ত,
শিক্ষাকর্মী

ক্লান্ত বরষার গোধূলিবেলায়
হিমের পরশ লাগল পাতায়,
শিশির ভেজা ঘাসের আগায়
শরৎ রাণী এল গুনগুনিয়ে –
ভোরের বেলায় শিউলি তলায়।

মাঠ ভরা ওই আমন ধানে –
সাজল ধরা সবুজ প্রাণে,
বসল সভা পদ্ম বনে -
ভ্রমর অলির গুঞ্জরণে
শীতের পরশ লাগল প্রাণে।

মাতলো মন আগমণী গানে
শারদ এল বাংলার প্রাণে
লাগল দোলা কাশের বনে
গতি হারায়ে শান্ত সে নদী,
বইছে যে আজ আপন মনে।

বিষাক্ত প্রেম

সংগ্রাম মল্লিক
প্রথম সেমিস্টার, বি.এ.অনার্স

একটু একটু করে দূরে সরে যাওয়া
নতুন নেশায় পুরাতন বাঁধন ভাঙা
যে হাতে ধরে হাঁটা শিখিয়েছিল,
আজ সে হাতই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

মিথ্যে ভালোবাসার রঙ মেখে
কেন সব সম্পর্ক তুচ্ছ করে ?
চোখে দেখি জন্মদাতার নীরব কান্না
নিজেরই হাতে কেন আজ তাদের কষ্ট দেওয়া।

তারা তো কেবল চেয়েছিল সুখ
কেন আজ তাদের ভাগ্যে শুধু দুখ
যে বুক জুড়ে বড় হয়েছি
সেই বুকে আজ বিষের কাঁটা পুঁতেছি।

রাতের আঁধারে জ্বলে ওঠে স্মৃতি
চোখের কোণে ভাসে তাদের বিষণ্ণ ছবি
প্রেমের আগুনে পুড়িয়েছি সব কিছু
এখন আমি কেবল এক দোষী।

হয়েছি এক পাপী, এক বিশ্বাসঘাতক
যারা আমাকে জন্ম দিল, তাদেরই করেছি আঘাত
এই প্রেম এখন বিষাক্ত ফল।
কষ্টে ভরে দিয়েছে তাদের হৃদয় স্থল।

কমফোর্ট জোন

শিতারা পারভিন
বি.এম.এল.টি., তৃতীয় সেমিস্টার

মানুষ মুখ ফুটে সুখ বলে, নিজেকে সুখী দেখায়।
কিন্তু মানুষ মুখ ফুটে দুঃখ বলে না,
যতক্ষণ না কেউ তা ভীষণ বায়না করে জানতে চায়।
নিজেকে সুখী দেখানো খুব সহজ।
তাই মানুষ তার চোখ-মুখ, কাজ, লেখা ও বাস্তবে কিংবা
ভার্চুয়ালে সব কিছুতে নিজেকে ফ্লেক্সিবল দেখায়,
স্ট্রং দেখায় এবং সবাই এটাই দেখে।
কিন্তু দুঃখ দেখানো কঠিন, দুঃখ জানানোও কঠিন।
দুঃখ সবাইকে বলা যায় না,
মন খারাপের কারণও সবাই কে বলা যায় না।
কেমন আছি-র জবাবে 'সত্যি ভালো নেই'এটাই লেখা যায় না
দুঃখ বলার জায়গাটা কমফোর্ট জোন হতে হয়,
শোনার আকুতি থাকতে হয়,
হাতে সময় থাকতে হয়,
ধৈর্য্য থাকতে হয়,
চোখের শীতলতা থাকতে হয়।
যার এই কমফোর্ট জোন আছে, সে ব্লেসিং।
আর যার নেই সে মূলত একা,
ভীষণ একা।

কিছু কথা কিছু ব্যথা

পম্পা তুঙ
ভূগোল অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

মাঠে এখন অগুন্তি কাশফুল,
বাতাসে শিউলির গন্ধ
আশ্বিনের আকাশে পেঁজা তুলো,
মনে করায় আনন্দময়ীর আগমণের বার্তা এলো।
এবার লিখতে বসে মনটা ভারাক্রান্ত
দেশের কী হবে ?
আমরা সবাই কী এক থাকতে পারবো ?
মা তুমি ভালোভাবে এসো
আশাকরি তোমায় দেখতে যাবো
কারুর উপর রাগ করে থেকো না
তুমি তো মা!
আবার বলছি, যদি ভালো থাকি
সবাই মিলে তোমায় দেখতে যাবো ঠিকই।।

আরশি

সোহিনী চক্রবর্তী
প্রথম সেমিস্টার, ইংরেজি

অমাবস্যার অন্ধকার কাটিয়ে
ভোরের মিঠা আলো যখন ফুটছিল
মাটির কুঁড়ে ঘরে মেয়ে হওয়ায়
আঁতুড় ঘরেই মাকে সবাই দুষছিল
বাবা সবারে চুপ করিয়ে নাম রাখলো
আলো।।
ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট মেয়ে
আনন্দেতেই থাকে
জানে না কত পশু লুকিয়ে আছে
এগিয়ে যাওয়ার পথে।
ছোট্ট মেয়েটা স্বপ্ন দেখে
ডাক্তার হলে পরে
সেবা করে জায়গা নেবে
জনগণের মনে।
ওরে শিশু, ওরে অবোধ
ঘুন ধরছে সমাজে,
গণতন্ত্র আজ নির্বোধ
বুদ্ধিমানরা হারিয়ে বুদ্ধি
সবাই হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী
কার ঝুড়ি ভরবে আগে
কত টাকা, সম্পদে
অন্ধকার খোঁজে আলোর পথ
দুর্নীতি খোঁজে ন্যায়।
অন্যায় খোঁজে বিচারের পথ
প্রতিবাদের ভাষা কী পাবে সফল মনোরথ।
মেয়েরা এখন গ্রামে গঞ্জে নগর জুড়ে থাকে
মেয়েরা এখন কম পয়সায় লোকের বাড়িতে খাটে
সেই মেয়েরাই বাড়ির ভরসা, রাত জেগে বই পড়ে,
মেয়েটা আমার হাসপাতালে নাইট ডিউটি করে,
সেই মেয়েটাই পাকিস্তানকে সব্‌ক শিখিয়ে আসে।
ওরাই আজ সমাজকে শেখায় প্রতিবাদের ভাষা
আসলে ওরাই আমাদের আশা ও ভরসা।

মূল্য

পায়েল ঘোষ,
ইংরেজি অনার্স, পি.জি., প্রথম সেমিস্টার

কেউ বা আমায় কাঁচ ভাবে,
কারো কাছে দামী।
কেউ বা আবার চোখে হারায়,
মানুষটা সেই আমি।
কারো কাছে মোটামুটি
কেউ বা ভাবে ফেলনা।
কেউ বা করে অকারনেই
কাছে আসার বায়না।
আমাকে কেউ আগলে রাখে
কেউ বা ছুঁড়ে ফেলে।
কেউ বা কষ্টে পাশে থাকে,
আর কেউ পুতুল ভেবে খেলে,
কেউ তো কেবল হিংসে করে,
দেখলে জ্বলে যায়।
এই আমিটাই কারোর কাছে
বেঁচে থাকার উপায়।
সবার কাছে হব না সমান
যার যেমন অনুভব।
কারো কাছে শূণ্য আমি,
কারো কাছে সব।

প্রকৃতি

লাবনী ভঞ্জ
ইংরেজী অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

ওই দূরে চেয়ে দেখ সবুজ পৃথিবী আর দিবাকর
ওইখানে কান পেতে শোন পাখিদের সুমধুর স্বর
ওই দূরে চেয়ে দেখ চাঁদের স্নিগ্ধ আলো
হে পৃথিবী তোমার সবকিছুই যে ভালো।
ওই দূরে চেয়ে দেখ উত্তাল সমুদ্র
ঢেউয়ের তালে গেয়ে ওঠে সাগরের মন্ত্র
হে প্রকৃতি তোমার মাঝেই মেলে জীবনের রূপ
তোমার কোলেই লুকিয়ে আছে আসল মনের সুখ
তোমার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় মুছে যায় সব কালো
হে পৃথিবী তোমার সবকিছুই যে ভালো।

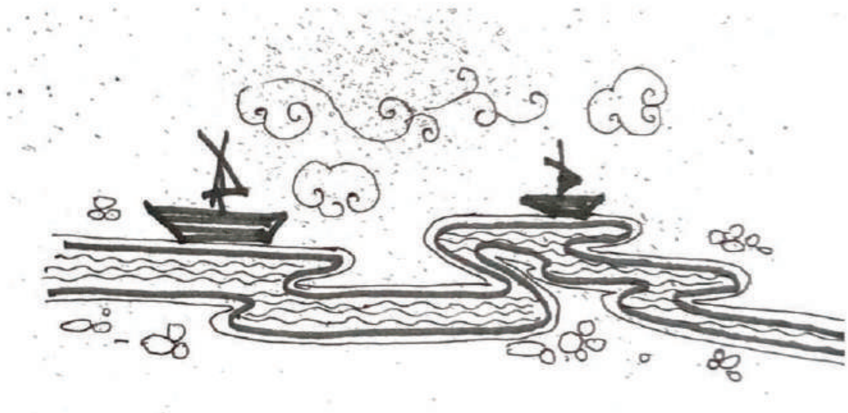

বীরঙ্গনা মাতঙ্গিনী

তনুশ্রী রায়
ইংরেজী অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

বীরঙ্গনা মাতঙ্গিনী ভারতেরই মেয়ে
জন্ম নিলেন মায়ের কোলে কতই সোহাগ নিয়ে।
ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন তিনি
মৃত্যুঞ্জয়ী বীরঙ্গনা অমর মাতঙ্গিনী,
নেই আজ মোদের মাঝে মাতঙ্গিনী মাতা
তবু জানাই সবার নিকট সেই মায়েরই কথা।
স্বপ্ন তাহার সত্য হয়েছে, সত্য হয়েছে আশা,
স্বাধীন ভারত জুড়ে আছে তাহারই ভালোবাসা।

পাগলা হাতি

আকাশ মুখার্জ্জী
প্রথম সেমিস্টার, বি.এ.আর্টস

বনে ছিল এক পাগলা হাতি,
করত সে দারুন ক্ষতি।
মাঠে চাষিরা করত চাষ,
হাতি করত তাদের সর্বনাশ।
একদিন সে ঢুকল গ্রামে
সবাই ছুটে ধনে প্রাণে।
উপর মহলে খবর গেল
অফিসারেরা গোলাগুলি নিয়ে এল।
হাতির দিকে লাগিয়ে তাক
গুলি চালাল ঠিকঠাক।
গুলি খেয়ে হাতি বলল হেসে
চললাম আমি ঘুমের দেশে।

বন্ধু

চণ্ডী মাহাত
ইংরেজী অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার

বন্ধু শব্দ অনেক ছোট
কিন্তু অনেক নামী
আমার সব বন্ধুগুলো
হীরের থেকেও দামী।
তোরা সবসময় পাশে আছিস
কোনো চিন্তা থাকে না
আমি কোনো সমস্যায় পড়লে
ওরা তো ছেড়ে থাকে না।
সব বন্ধুরা ভীষণ প্রিয়
কখনো পিছু ছাড়ে না
খাওয়ার নিয়ে কাড়াকাড়ি
কখনো করতে রাখে না।
সবকিছু আর বললাম না
তোরা খুব ভালো
পরবর্তী জীবনে তোরা
হবি দেশের আলো।

স্বপ্নের পথে

সোমনাথ চক্রবর্তী
ইংরেজী অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার

মানুষের জীবনে স্বপ্ন শুধু ঘুমের ভিতরের কল্পনা নয়, এটি আমাদের জাগ্রত দিনের পথপ্রদর্শক। একটি ছোট্ট স্বপ্নই মানুষকে বড় যাত্রায় পাঠায়, বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। কলম হাতে নেওয়া ছাত্র, মাঠে নেমে খেলা শুরু করা খেলোয়াড়, কিংবা বইয়ের পাতায় ডুবে থাকা পাঠক সবাই একদিন তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে হাঁটছে। তবে স্বপ্ন পূরণ সহজ নয়।

পথে আসবে বাধা, ক্লান্তি, অবহেলা – কিন্তু যারা বিশ্বাস ধরে রাখে, তারাই শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছে যায়। পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্যোদয় দেখার আনন্দ যেমন কেবল সেই পায় যে চূড়ায় ওঠে, তেমনই জীবনের সেরা সাফল্য পায় সেই মানুষ, যে নিজের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

আজ আমরা তরুণ প্রজন্ম, হাতে অসীম সম্ভাবনা। প্রযুক্তি, শিক্ষা, সৃজনশীলতা – সবই আমাদের হাতের নাগালে। শুধু দরকার সাহস, ধৈর্য আর নিজের উপর ভরসা। একদিন আমরাই এই পৃথিবী বদলাবো- স্বপ্নের রঙে, পরিশ্রমের আলোয়।

তাহলে চল, নিজের ভেতরের আগুন জ্বালিয়ে তুলি। হয়তো তোমার ছোট্ট স্বপ্নটাই একদিন ইতিহাস হয়ে যাবে।

বিষণ্ণতা

মন্দিরা খামরই
বাংলা অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার

নীরব নিরাকার এ জীবন হায়
তোমার স্বপ্নে এ দুটি চোখ
যেন হঠাৎ ভিজতে চায়।।

স্বপ্ন, শান্তি আর ভালোবাসা
যেন কোথায় গিয়েছে উড়ে
বুক ভরা বেদনায় আজ
হৃদয় গিয়েছে পুড়ে।

কি চেয়েছি, কি পেয়েছি
যখন তার হিসেব করি মনে
পাওয়ার থেকে হারানোর যন্ত্রণা
যেন দানা বাঁধে এ হৃদয় কোণে।

স্বপ্নের স্মৃতি যেখানে
ডানা মিলতে চায়
দুঃখ বিলাসী মন আমার
বেদনাকে কাছে পায়

চাওয়া পাওয়ার মাঝে
আজ দূরত্ব অনেকখানি
পাওয়ার থেকে হারিয়েছি বেশি
জানি না পেয়েছি কতখানি।

মানুষ নিজে হারে
হারিয়ে ফিরে পায় অনেক কিছু
তাই তো মন পারে না, না চেয়েও
স্বপ্ন দেখার পিছু।

সময়ের স্রোত

পিউ ভৌমিক
ফিলোজফি অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার

সময়ের পায়ে পায়ে
দিন আসে দিন যায়
আমি ফেলে শৈশবের দিন।
কৈশোরের চপলতা
দিনগুলো ছিল যে রঙিন।
যৌবন উদাস
ছোটর কালঘাম
ভেঙে ফেলে সকল বাঁধন -
কত হাসি কত গান।
উজ্জ্বল কলতান
দেহে মনে জাগায় মাতন।
এও যে যায় যায় মনের অলসতায়
চলমান ছবি শত শত
হারায়ে ফিরিয়া পাব
ফেলে আসা গান গাব
ভেবে আর কাজ নাই এত।

নিরুপায় নারী

নবনীতা পাত্র
বি.সি.এ., প্রথম সেমিস্টার

বলতে পারো, নারী তুমি নিজে কী পেলে ?
তুমিও ছিলে বাবা-মা এর একমাত্র সন্তান।
তুমিও হতে চেয়েছিলে একজন ডাক্তার
মানুষকে কষ্ট থেকে দিতে পরিত্রাণ,
নিয়তির পরিহাসে হারালে তো, তোমার নিজের প্রাণ ?
সত্যের জন্য হলে বলিদান
মুখর হয়ে ভুলে গেলে তুমি
স্বাধীন ভারতে সত্যের যে অল্প স্থান।
তেমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করল যারা
পশুর চেয়েও হিংস্র তারা।
হোক না যতই হিংস্র!
ভগবানের দরবারে, নারীর সতীত্বে সারা জগৎ সৃষ্টি
যে নারীর গর্ভ হতে ওরা মুক্তি
যে নারীর মায়ায় ওরা পালিত
সেই সতীত্ব ছিনিয়ে নিয়ে ওরা
পাবে কি শান্তি ?
আমরাও কী তবে বাঁচবো এভাবে!
চোখের অশ্রু ঢেলে
না ....
এগিয়ে যাব পিছিয়েপড়া সমাজটাকে ফেলে।

রেল

শিবনাথ সিং
ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমি

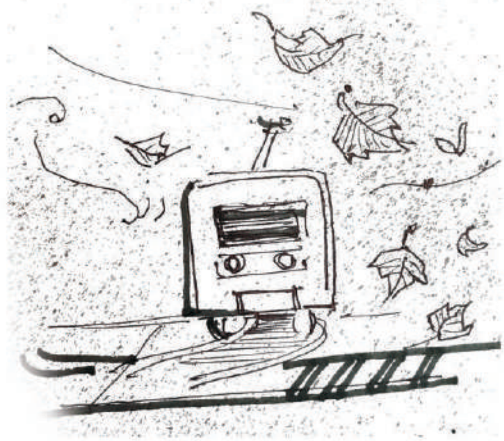

আকাশ দাদা মায়ের সাথে, যাচ্ছে মামার বাড়ি
হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া ছুটলো রেলের গাড়ি।
ছাড়লো গাড়ি ঝিকঝিকিয়ে, নেই বুঝি তার তাড়া!
একটু পরেই স্টেশন এলো, নাম টিকিয়াপাড়া
মায়ের পাশেই বসে আকাশ, চক্ষু দুটি ডাগর।
দ্বিতীয় স্টেশন এসে পড়ে নামটি দাশনগর
রাম ঠাকুরের হয়তো পুজো, বসে দারুণ মেলা!
এই তো এল পরের স্টেশন রামরাজাতলা
ঝিল দেখা যায় ঐ তো পাশেই, উড়ছে কত পাখি।
দেখল আকাশ রেলগাড়িটা ঢুকলো সাঁতরাগাছি
বাদাম ভাজা কিনলো এবার, মা মিটালো দাম!
থামলো গাড়ি নতুন স্টেশন, নাম মৌড়িগ্রাম
ঘুঘনি খাওয়ার বাসনাটা, করলো মা ভন্ডুল।
আধঘণ্টায় ট্রেনটা এলো, রাজার বাড়ি আন্দুল
আকাশ শুধায় বলতো মা, এলাম কত মাইল!
মাইল দশেক হবে বুঝি, সবে তো সাঁকরাইল
পরের স্টেশন খুব নির্জন, পাশেই জলকাদা
আকাশ দেখে লেখা আছে মামার নাম আবাদা।

একটু ভাবো

সঙ্গীতা মিশ্র
ফিলোজফি অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

হয়তো তুমি অনেক কিছুই জানো,
কম্পিউটারের নেট টা ঘেঁটে বার করে সব আনো
সেল ফোনেতে অনর্গল বলতে পারো বেশ,
তুলছ ছবি মুহুর্মুহু, পাঠাও এস.এম.এস.
মুখের কথা ইংরেজিতে, বাংলাটা তো নাই,
পছন্দ নয় অন্য পোষাক, জিনিস-ই শুধু চাই।
নিজের নিয়েই ব্যস্ত ভীষণ-স্বপ্ন আমার মনে,
স্ট্যাটাস যেতে আর কটা দিন — তারই হিসাব গোনে।
বুদ্ধিওলা তোমরা হলে দেশের ভবিষ্যৎ
ভাবনাগুলোর এই বইয়েতে ঘোরাও গতিপথ।
তোমার শুধু বাবা-মা নন এই কথাটা মানো
দেশও তোমায় মানুষ হতে কি করে, তা জানো ?
তোমরা শুধু নিজের ছেড়ে ভাবো দেশকে নিয়ে —
দেখতে পাবে সত্যি সত্যি দেশ যাবে পাল্টিয়ে।

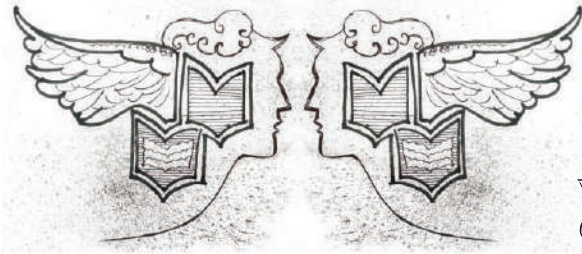

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

রঘুনাথ সিং
বাংলা বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

আমরা এমন এক সমাজে বাস করি,
যেখানে চুলের স্টাইলে মাপা হয় শৃঙ্খলা,
যেখানে জামার ব্র্যান্ডে মেলে মানুষের অবস্থান,
আর টাকার অঙ্কে নির্ধারিত হয় মানবতা।
মনের সৌন্দর্য কেউ খোঁজে না,
হৃদয়ের গভীরতা কেউ আর বোঝে না।
দেখে শুধু মুখের সাজ, চোখের রঙ,
ভেতরের কষ্টগুলো যায় যেন হারিয়ে।
আর তিন ঘন্টার এক পরীক্ষা
যার নম্বরেই নাকি চূড়ান্ত বিচার।
কে কত পড়ছে, কে কত টেনেছে জীবন,
তা নয় বিষয় – শুধু ফলাফলেই হয় সীমানা নির্ধারণ।
এই সমাজ ভালোবাসা মাপে উপহারে,
সততা মাপে পরিচিতিতে আর টাকার অঙ্কে
মনের মানচিত্র যেখানে গৌন,
বাহ্যিক সেখানে মৌন।

মনের কথা

রাজকুমার ভৌমিক
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

মা'রে তুই কোথায় গেলি আমায় এ জগতে একা ছেড়ে
আমি যে মা ছিলাম নির্মম শিশু, এ জগতের সাথে দাঁড়াতে।
পারছিনে যা এই মায়াময় জগতে,
ঘড়ির কাঁটার মতো চলতে,
যেখানে শুধু সব ছুটছে, একটু সুখের আশা করে।
আমিও যা করেছি বহু চেষ্টা, এ জগতের সাথে মিলিয়ে চলতে।
কিন্তু যারে এ জগতে চলে না কোনো মানুষেরি,
চলে তো শুধু অর্থের বলি, হারিয়েছে মানবতারে
অর্থই সুখ, অর্থই সম্পদ, অর্থই সবের আশারে
অর্থের পেছনেই তো চলে এ জগতের সমস্ত ভালোবাসারে।
আয়, যারে এই মানব জন্ম চলে তো শুধু কর্মেতে,
তাই যারে জড়িত হতেই হবে এই সাংসারিক ...
কত দুঃখ, কত কণ্ঠ চেপে রাখি মা এই মনের ভিতরে,
মন যে বলে আয় ক'দিনরে ভাই রাখবি মনের মাঝখানে।
মনকে বলি আর বলবো কাকে রে ভাই,
কে বা শুনবে আমার মনের কথা এই ব্যস্ত জগতের মাঝে.
আর পারছিনে মা থাকতে এ জগতে, নির্ঘুম চোখ নিয়ে,
তাই শেষ ব্যথাটা নিতে মা তোর, চাই আঁচল পেতে মাথা রেখে বসতে।

DIGITAL

পিকু দোলই
বি.সি.এ, তৃতীয় সেমিস্টার

Book এখন খুব অচেনা,
Facebook টা সবার চেনা।
you মানে আর 'তুমি' না,
youtube ছাড়া দিন কাটে না।
Gram লেখাটা খুবই কমন,
Instagram যে তাইতো শোনা।
Ludo এখন দোকানে না,
Ludoking ছাড়া খেলা জমে না।
Play আর এখন মাঠে মানায় না,
Play Store ছাড়া পাই না।
What মানে এখন শুধু 'কি' না,
Whatsapp ছাড়া আর কিছু ভাবাই যায় না।
Shopping আর Offline একদম বোরিং
Shopping in online ঝামেলা ঝনঝাট হীন।
নতুন কোনো ঠিকানা একেবারে অচেনা,
চিন্তা করবেন না Google map আছে না।
Life Partner খুঁজছেন কিন্তু পাচ্ছেন না,
Matrimonial থাকতে আর অসুবিধা হবে না।
কোনো প্রশ্নের উত্তর জানো না,
ChatGPT আছে তো, তোমার চেষ্টা বৃথা যাবে না।
ওহ Trend এর কথা তো বলাই হলো না।
follow না করলে আবার Status বজায় থাকে না।
Ghibli ছিল চিত্রকরদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফল,
যা AI করেছে স্বল্প সময়ে তৈরী এক Trend এর ছল।
একসময় চিঠির জন্য যোগাযোগ ছিল সম্ভব,
আজ চিঠি 'Message' হলেও মানুষের সময় পাওয়া অসম্ভব।
বর্তমানে লেখালেখির রেশ কমেছে ঠিকই,
কবিতার নাম 'DIGITAL' কেন বুঝতে পারলেন কি।।

ঋতুরাজ বসন্ত

জয়শ্রী মণ্ডল,
ইতিহাস অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

রাজা রাজা ঋতুর রাজা
বসন্ত হল ঋতুর রাজা।
কোকিলের কুহু স্বরে
ভরে যায় মন যে।
গাছে গাছে নতুন পাতা
আবিরে রাঙা আকাশ ধারা।
দোলের আনন্দ ভরা চারিদিকে
পলাশ শিমুল আগুন জ্বালে।
চারপাশে ফোটে ফুল
আম্র শাখায় আম্র মুকুল,
শিশির ভেজা দিনের শুরু
শীতের সমাপ্তি গ্রীষ্মের শুরু।
বর্ষ পঞ্জিকার শেষ ঋতু
নতুন বছরে নতুন শুরু।

মায়া প্রলয়

আহির কাশ্যপ
জুলজি বিভাগ, প্রথম সেমি

যা চাই আমি, তা পাই না হাতে,
যা করি শেষে, তা মিশে আঘাতে।
কর্মের পথে ধরা দেয় দ্বন্দ্ব,
আনন্দে ভরে, আবার আনে ছন্দহীন ছন্দ।

জীবনে জ্বালে মিথ্যার সাঁঝ,
সুখের ভিতর লুকায় যে ভার
আনন্দ যতই কাছে এসে যায়
শেষে দুঃখ হৃদয় ভরায়।

পদ্ম ফুটে ওঠে পরিবর্তনের স্রোতে,
বায়ুর জালে মন হারায় সাথে
তবুও সমুদ্রের তীরে খুঁজি আশ্রয়,
তার কূলে পৌঁছানো লক্ষ্য নয়।

মায়া পক্ষী নিয়ে আনে আশা,
সত্য খোঁজে জীবনের ভাষা
ঊষা প্রাতেঃ আলো জ্বালায়,
রাত্রি অন্ধকার বিদায় চায়।

নারীর সংগ্রাম

সৌমি দত্ত
বি.এ. জেনারেল, তৃতীয় সেমি

শত শত বছর ধরে
নারী ছিল নীরব,
শৃঙ্খলের বাঁধনে বন্দি
আজ হতে চায় সরব।

অন্ধকার প্রথার দেওয়াল
অজ্ঞতায় ঘেরা প্রাচীন,
পুরুষের অহংকারে ঢাকা পড়েছিল
নারীর স্বপ্নের নীড়।

তবুও থামেনি নারী
জ্বলে উঠেছে তার চোখ,
জরাজীর্ণতার হিংসার শিখায়
হয়নি তার ধৈর্য্যের লোপ।

নীরব কান্নার ভিতর
আগুনের মতো জেদ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার বলেছে
যুদ্ধের হয়নি এখনও শেষ।

নারী মানে শুধু আঁচল নয়,
নয় রান্নাঘরের ধোঁয়া,
নারী মানেই সৃষ্টির আলো
ভোরের প্রথম ছায়া।

লাঠির আঘাতে রক্ত, তবু ন্যায়ের সংগ্রাম

পল্লব গুছাইত,

ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক আজ,
চাকরি হারা বেদনার সাজ
ন্যায় দাবিতে পথে নামে,
অন্যায়ের বোঝা বুকে সামলে
লাঠি পড়ল শিক্ষকের গায়ে
লাথি মেরে দিল মাটির ধুলোয়,
কলম ধরা হাত রক্তে ভেজে
স্বপ্ন ভাঙে নির্দয় চাপে।
শিক্ষকের গৌরব পায়ের তলায়,
এ কেমন দেশ, এ কেমন ছায়া!
ন্যায়ের জন্য চলবে সংগ্রাম
শিক্ষক বাঁচাও -এ আমাদের প্রণাম

তোমার মেয়ে, আমার মেয়ে

মল্লিকা দাসমাল
বাংলা স্নাতোকোত্তর, প্রথম বর্ষ

তোমার মেয়েই তো মেয়ে
তাই তো ত্রিশেও আজ সে নারী,
আমার মেয়ে তো মেয়ে নয়
তাই সে কুড়িতেই আজ বুড়ি।
তোমার মেয়েই তো মেয়ে
তাই পরেছে রেশমী চুড়ি
আমার মেয়ে তো মেয়ে নয়
তাই খাচ্ছে শুকনো মুড়ি।
তুমি মেয়ের জন্য খুঁজে বেড়াও
বাবার সংজ্ঞা,
আমি খুঁজি মেয়ের জন্য কাজ
কাল কি খাওয়াবো ভাবছি বসে আজ।
তোমার মেয়ে খুব বিলাসী
আমার মেয়ে ভীষণ হিসেবী
তোমার মেয়ের অশ্রু নাকি
চোখের জলের নাম,
আমার মেয়ে কত কেঁদেছে
কেউ দেয়নি দাম।
আমার মেয়ে হতভাগী
তোমার মেয়েই তো ভাগ্যবতী।

অনুভূতি

স্বর্ণিকা দে
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

প্রেম ? সে কি নীরবেই আসে ?
সে কি ভোরের আলোর মত উজ্জ্বলিত এক অদম্য শক্তি ?
নাকি আস্তাবলের অশ্বর দুরন্ত গতির স্থিতাবস্থা ?
প্রেম ? সে কি বৃষ্টির ফোঁটার মতো নীরব সুরে ঝরে ?
সে কি চোখের গভীরে অচেনা আলো জ্বেলে দেয় নিরন্তর ?
নাকি হৃদয়ের অচেনা বেদনার মাঝে রঙিন ডানায় ভাসে ?
প্রেম তো এক অনন্ত যাত্রা, যেখানে শুরু আছে, শেষ নেই কখনো।
সে শুধু নিঃশব্দে হৃদয় ছুঁয়ে যায়, রেখে যায় অবিনশ্বর প্রতিধ্বনি।

শুকতারা

ইয়াসমিন খাতুন
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

ব্যর্থতায় ভরা জীবন নদে
আমি এক ব্যর্থ মাঝি
হারিয়ে যেতে চাইলেও
আবার পাড়েতেই ফিরে আসি।

হয়তো তোমায় বলিনি কোনোদিন
তুমি ছিলে আমার স্বপ্ন তরী
আর তোমার মনটা ছিল
আমার নদীর বাড়ি

যদি কোনোদিন হারাই ওই নীল আকাশে
ভেবো না যেনো তুমি সঙ্গীহারা
থাকবো পাশে সর্বক্ষণই
মৃত্যুর পরেও আমি তোমারই তারা।

ভালোবাসার সংবিধান

সৌম্য শীট
ইংরেজি অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

চাইনি অনেক কিছু, চেয়েছি একটু মন
যেটা ভালোবাসার সংবিধানে লেখা কিছু লিখন।
হৃদয় যদি হয় অনুভূতিহীন,
তবে তার অনুভূতির মূল্যায়ন হয় মূল্যহীন।
অনেক করে চেয়েছি তোমায়,
তাই বিন্দুমাত্র পাইনি।
হয়তো ভালোবাসার সংবিধানে
খুব করে চাওয়া বেআইনি।
তাই তো কারণে অকারণে নিয়ম করে,
তোমার মায়াতে পড়ছি জড়িয়ে আমি বারে বারে।
যা পেয়েছি তা কিছু কম নয়, সব কিছু ছিল সত্যি
দিনের শেষে তোমায় ছাড়া সেগুলো হল স্মৃতি।
আশা তো তুমি দেখিয়েছো,
অবহেলাও তো তুমি করেছো।
তবুও ভালোবাসার নৌকাতে ভাসতে ইচ্ছে করে,
তোমার হাতটি ধরে।

আমার স্বপ্ন

নেহা পারভিন
ফিজিওলজি অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

আমার স্বপ্ন অনেক বড় দেখাই শুধু তারা,
সবাই বলে কি করবি এই স্বপ্ন দ্বারা।
স্বপ্ন আমার যতই হোক না কেন ছোট,
পূরণ করার দায়িত্বটা আমাকে নিতেই হবে বড়।

আমার বড় বড় পদক্ষেপে আসবে অনেক ঝঞ্ঝা,
ঝঞ্ঝাটাকে কাটিয়ে তোলার আছে অনেক পন্থা।
প্রত্যেকটা পন্থায় আছে আমার অনেক স্বপ্ন,
স্বপ্নটাকে ভঙ্গ করতে হবে অনেক অঙ্ক।

প্রত্যেকটা অংকই হল আমার জীবন চলার ধাপ,
ধাপগুলোকে অতিক্রম করা আমারই তো কাজ।
প্রত্যেকটা কাজেই আছে, আমার ইতিহাসের পাতা।
পাতা যে কবে উন্মোচন হবে তার নেইকো কোনো ঠিকানা।

তবু প্রত্যেকটা ঠিকানাকে, দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে শেষ
শেষ হলে আসবে আমার আসল স্বপ্ন দেশ।
স্বপ্ন দেশে পাড়ি দিলে, আমার হবে অনেক মজা।
মজাটাকে মজার মত নিলেই হবে, আমার, অনেক বড় সাজা।

সাজা সাজা করে আমার জীবন হল শেষ,
শেষ বলে কিছুই হয় না, কারণ আছে আমার আসল স্বপ্ন দেশ।
স্বপ্ন স্বপ্ন বললে শুধু, হয় না স্বপ্ন পূরণ
স্বপ্নের কাজ বাস্তবেতে করতে হবে স্মরণ।

জগৎমাতা

সেক মুস্তাফিজুর রহমান,
এডুকেশন অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

জগৎমাতা আমার ভূমি
তুমিই আমার ত্রাতা,
তুমি আমায় সৃষ্টি করে
হয়েছো মহান দাতা।
তোমার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়
আমি, প্রাণে খুঁজে পাই বাঁচার শক্তি,
হচ্ছি বড় আমি মনে প্রাণে,
বাড়ছে শুধুই তোমার প্রতি ভক্তি।
তুমি অমনি ভাবেই আগলে রেখো
এই অধমের জীবনখানি,
তোমারই ভূমিতলে থাকবো আমি
হৃদয়ের অটুট বন্ধন রাখি।
তোমার চরণ ধূলি মাথায় ভরে
এগিয়ে যাওয়ার শপথ গড়ি।
পারবে না কেউই আটকাতে আমায়
সমস্ত মায়ার বন্ধন মুক্ত করি।

মহাশক্তির দুই রূপঃ মা দুর্গা ও মা কালী

পল্লব গুচ্ছাইত
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

শারদ ভোরে বাজে শঙ্খের ধ্বনি,
শিউলির গন্ধে ভরে ওঠে ধরণী।

দশভুজা মা আসেন সিংহাসনে,
অসুর দমনে দাঁড়ান মহারণে।

আলো ছড়িয়ে দেন তিনি সর্বত্র,
অশুভ মুছে দেন শক্তির অস্ত্রে।

কিন্তু কয়েকদিন পর নেমে আসে রাত,
শ্যামার আগমণে কেঁপে ওঠে মর্ত।

গলায় খুলি, হাতে খড়্গ দীপ্ত,
অন্ধকারে জাগে জ্যোতির্ময় দৃষ্টি।

তিনি ধ্বংস, আবার তিনি করুণা,
অশুভের মাঝে, খুলে দেন নতুন দুয়ার।

দুর্গা আলো, কালী আগুন,
দুই রূপেই মায়ের অমোঘ সাধন।

ভক্ত হৃদয়ে বেজে ওঠে বাণী
শারদে দুর্গা, শ্যামা মা কালী।

স্বপ্নময় রজনী

পাপিয়া খাতুন
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

বৃষ্টির সোঁদা গন্ধে ভিজে উঠল চারপাশ,
নিস্তব্ধ গলিতে টুপটাপ ঝরে পড়ে যেনো রাতের আশ্বাস
ভিজে জানালায় আঁকা জলের কাব্যরেখা,
আজ সন্ধ্যেটা যে বৃষ্টির সাথে বড্ড বেশি একা।
আধো আলোয় ঝলমল করে পথের বাতি,
ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে জাগে শৈশবের স্মৃতি।
হঠাৎ আকাশ ফাঁক করে জেগে উঠে চাঁদ,
ঝলমলে সাদা আলোয় স্নান করল নদীর বাধ
মেঘের চাদরে ঢাকা সেই চাঁদের হাসি,
মনে পড়ে আজও আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

ভারতবর্ষ

সুকুমার টুডু
অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ

ভারতবর্ষ, ভারত আমার প্রাণ
ভারতবর্ষ নানা ভাষা নানান ধর্ম নানান পরিবার।
যেন নানান ধর্ম ফুলের গাঁথা মালা
এক সুতো তে মিলিত আমরা
একই মায়ের সন্তান।
দুঃখে সুখে এক সাথে
এক হয়ে বাস করি মোরা।
সাঁওতাল, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, জৈন,
মুসলমান
তবু কেন এত হিংসা এত লড়াই এত খুনোখুনির গ্রাস
চলো আমরা হিংসা ভুলিয়ে গাইবো জয়গান
ভারতবর্ষ, ভারত আমার প্রাণ।

বাঁচার লড়াই

চন্দনা সিং
ফিলজফি অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার

পড়তে পড়তে এতোদূর চলে এলাম
জল দিয়ে তারপর বীজ ছড়িয়ে দিলাম,
চোখ খুলে আকাশে তাকালাম চারিদিকে শুধুই ঝাপসা!
বুকের ওপর হাত রাখলাম মা'র তখনও কান্না থামেনি,
বাড়িতে অরন্ধন মা বসে আছেন বাজারের অপেক্ষায়
সকলেই সতর্ক তবুও আমরা অসহায় কর্মের জন্য।
ফুটপাতে নেমে ভাবতে লাগলাম,
একমাত্র আমি জানি কতটা অসহায়।
তারপর শূণ্য পকেটে চিৎকার করে বলতে লাগলাম
'আসুন বেঁচে থাকতে করি লড়াই'।

ছন্দ

প্রীতম ধল
বি.এ. জেনারেল, তৃতীয় সেমিস্টার

কবি কবি ভাব
শুধু শব্দ নয় – ছন্দেরও অভাব
বড়ো কথা বড়ো ভাব, আসে না কো মাথায়
কবিতা বা ছড়া লেখার জন্য কোনো ছন্দই নাই,
কেমন করে লিখব আমি পাই না ছন্দ খুঁজে
যদিও বা পেলাম কয়েকটি ছন্দ
পারিনি উঠতে বুঝে।
ছন্দ দিয়ে লিখে গেছেন রবির মতো কবি
এঁরাই পেয়েছেন মনের মাঝে,
ছন্দ গাথা ছবি,
কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মনের মাঝে রোজ
নানা ছন্দরূপের করে যাই খোঁজ।

আমার লেখা কবিতা

মৌমিতা চক্রবর্তী
নিউট্রিশন অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

কবিতা লেখার শখটা আমার
বহুদিনের ছিল।
হঠাৎ করে লিখতে বসে
গোলমাল হয়ে গেল
বিরক্ত হয়ে খাতা কলম
দিলাম ছুঁড়ে ফেলে
পেনটা গিয়ে পড়ল শেষে
এক লাল বালতির জলে।
হঠাৎ রাতে স্বপ্ন দেখি
কবি হয়ে গেছি।
ম্যাগাজিনে নাম ছেপেছে
আমি তো দারুন খুশি,
সেই খুশিতে হঠাৎ করে
ঘুমটা গেল ভেঙে
চমকে উঠে দেখি
আমি বাস্তবে এসেছি নেমে
আমি আসলেই কবি নই
অতি সাধারণ একটি মেয়ে
তখন শুনি মেয়ের গলা
মা করছেন বকাবকি
কারণ আজ কলেজ যাইনি
দিয়েছি একটু ফাঁকি।

কালের বিচার

সংগ্রাম মল্লিক
বাংলা স্নাতোকোত্তর, তৃতীয় সেমিস্টার

সেদিন তুমি রেখেছিলে মান,
দ্রৌপদীর সজ্জা, তার জীবনের প্রাণ।
বস্ত্র দিয়ে ঢেকেছিলে প্রকাশ্য সভায়,
তবু কেন শাস্তি তার প্রাপ্য নয় ?
কেন সেদিন সবাই মৌন ছিল ?
যখন কৌরবের হাতে নারীর সম্মান গেল;
কেন সেই অন্যায়ের সরাসরি শাস্তি দিতে পারোনি ?
কেন সেই পশুর দলকে তখনি রুখে দিতে পারোনি ?
আজও সেই ইতিহাস ফেরে, সেই কুরুক্ষেত্রের মাঠে,
দ্রৌপদীর আর্তনাদ, আজও বাজে রাজপাটে।
কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, সেদিনও ছিল হাতে,
তবু কেন নীরব ছিল, নীরবতার সাথে।
অপরাধী ছিল চিহ্নিত, দুঃশাসন - দুর্যোধন,
তবুও শাস্তি পেল না, হলো না তাদের পতন।
অপেক্ষা হলো যুদ্ধের, অস্ত্র হাতে হাতে
নির্ণিত হলো বিচার, রক্তস্নাত পথে।
আজও ইতিহাস ফেরে, নারীর কান্নার সুরে
হাজারও দ্রৌপদী আজও সম্মান হারায় দূরে।
অন্ধকারে হিংস্র হায়না, খুঁজে ফেরে তার শিকার,
মিথ্যে মামলা, মিথ্যে সাক্ষী, বিচার হয় না আর
যদি সেদিন, সেই পাপীরা, সরাসরি পেত সাজা।
তবে হয়তো এই যুগে, কোনো নারী হত না মাজা।
তাহলে আজ এই যুগে নারীর সম্মানহানির আগে,
সেই পশুরা একবার ভাবতো, একবার হলেও থামতো।
যুগে যুগে নারী কাঁদে, তার শরীর হয় ক্ষত বিক্ষত,
ধর্মের নামে, সমাজের নামে, বারবার সে হয় পতিত।
মহাভারতের যুদ্ধে, দুই পক্ষেই ছিল অস্ত্র,
এই যুগে আমাদের হাতে, শুধু হতাশা, আর নিস্তব্ধতা।
আমাদের হাতে নেই কোনো চক্র, নেই কোনো শক্তি,
যুদ্ধ করার জন্য, আমাদের আছে শুধু তোমার ভক্তি।
তবুও এ যুদ্ধ চলে, রোজ চলে, অন্তহীন,
প্রতিটি নারীর চোখে, জ্বলে প্রতিবাদের দিন।

প্রকৃত বন্ধু

প্রীতম ধল
বি.এ.জেনারেল, তৃতীয় সেমিস্টার

পৃথিবীতে অনেক মানুষ
থাকে অনেক বেশে।
কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ
কেউ বা ছদ্মবেশে।।
কেউ থাকে লোকের কাছে
সেজে বড়ো ভালো
আবার কেউ কারোর কাছে
আবছা চাঁদের আলো
ভগবানের অদ্ভুত দুনিয়ায়
বন্ধু অনেক আসে।
প্রকৃত বন্ধু সেই হয়,
অসময়ে যে থাকে পাশে।

জীবনের গান

কুহেলি মুখার্জি
ইংরেজি অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

জীবন নামের খাতায় কী লেখা আছে কেউ জানি না।
তবে এইটুকু জানি জীবন একটা গানের মতো।
একটা গানে যখন সুর-তাল-লয়-ছন্দ সব থাকে খানিকটা সেই রকম-ই
জীবনেও সেইরকমই থাকে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশ-জন্ম মৃত্যু।
একটা গান যখন বাঁধি তখন এক বুক আশা থাকে, সেই গানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া।
তেমনই-নিজেদের খুঁজে পাই আমরা জীবন নাম খাতার পাতায়।
গানের যেমন সমপদী তাল থাকে
তেমনই থাকে বিষমপদী তাল।
সমপদী গন হয় মসৃণ
আর বিষমপদী হয় কঠিন, অমসৃণ
তাই তো আমরা বেশিভাগ সমপদী গান করি
বিষমপদী খুবই কম।
তেমনি-ই জীবনে যেমন সুখ থাকে
তেমনি-ই থাকে দুঃখ।
গান আর জীবন দুটোই অঙ্ক।
গানের তাল কাটলে যেমন গানে
কোনো মাধুর্য থাকে না।
তেমনি-ই দুঃখ এলে আমরা আর জীবনের
মাধুর্য খুঁজে পাই না।
ভুলে যায় ভালো মন্দ দুটো নিয়েই আমাদের জীবন।
তবুও আমরা পারি না সেটা মেনে নিতে।
গানের তাল কেটে গেলেও আমরা খুব কম
জন-ই গানের ভিতরে থাকা মাধুর্য খুঁজে বের করতে পারি।
ঠিক তেমন-ই আমরা খুব কম জন-ই জীবনের
সাথে দুঃখ মেনে নিতে পারি।
আমরা ভুলে যাই যে -
আসবে দিন আসবে রাত এই জীবনে
দুঃখ-সুখ আসে যায় সবার প্রাণে
এছাড়া স্বয়ং কবিগুরু বলে গেছেন
'মনেরে আজ কহ যে,
ভালো-মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে'।

অভিমান

সেজুতি মিশ্র
ইংরেজি স্নাতোকোত্তর, প্রথম সেমিস্টার

আসেনি আঁধার এখনো ধরায়
সূর্যের আভায় দিলো আকাশ ভরে
সুনীল আকাশে বলাকার নীড়ে
দল বেঁধে ফিরে যায়।
দূরে বনানীর রঙে রঙে রাঙা
তোমরাই ও রং মেখে।
সাজিয়েছে যেন করিবে বরণ
এই খোলা প্রাঙ্গণে।
এতো রং বলো পেয়েছো কোথায়
যা দিলে উজাড় করে
তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে
অভিনব সমভারে।
ক্ষণিকের আয়ু তবু তব আশা
কোমল মনের কোণে
সাজাবে নিজেকে স্বপ্নের দেশে
মায়া জাল বুনে বুনে।
কত সুন্দর লেগেছে তোমায়
নানা রং এ শাড়ি পরে।
তোমার মুখের মধুর হাসিতে
সোনা যেন ঝরে পড়ে,
পলাশের ফুলে তুমি রং দিলে
তোমারই তুলির টানে
জানি আমি জানি তুমি অভিমানী
যাব চলে অভিমানে।

বর্ষার বিকেল

রিফা রাফিয়া
নিউট্রিশন অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

আকাশটা আজ কালো
চারিদিকে অন্ধকার
হঠাৎ দেখি মেঘ গুড়গুড়
বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ
দেখছি কত পাখির দল
ফিরছে বাসায় দল বেঁধে,
দেখছি কত চাষির দল,
ছুট দিয়ে বাড়ি ফেরে
হঠাৎ দেখি দমকা হাওয়ায়
পড়ল ভেঙে চাষির ঘর,
উঠল কেঁদে পাখির দল,
স্থান হারা সব যাযাবর।

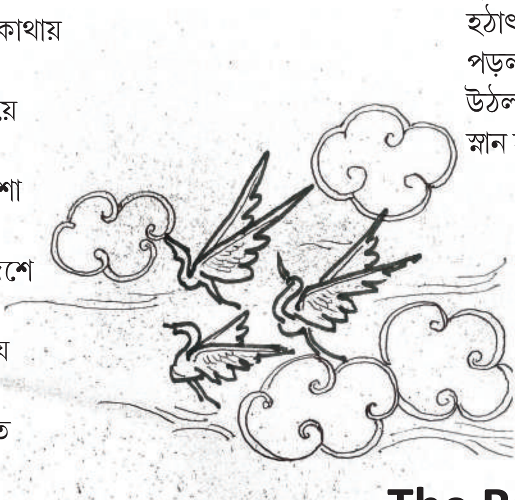

The Rainfall

Bikram Shit
1st Semester, English Major

It was a summer's afternoon
I set on my yard.
There was an unnatural silence
Had no noise to be heard.
Soon it was starting
a heavy rainfall.
That made a beautiful song.
The tree took a shower
And the boys played for a long time.
After the rain stopped its pattering
There was a pretty rainbow in the western sky.

The End That Stays Forever

Koustab Kanti Maiti
1st Semester, English PG

O my Mahavidyalaya, noble and true,
Our journey began in the year twenty twenty two.
Among your every red brick in the morning light,
We found our voices chased what's right.

You nourish us in lessons so deep,
Give the taste of literature on peak.
All classrooms are the blacksmith's fordge
Where minds were shaped with silent urge.

From Shakespeare's soul to Eliot's rhyme,
We all read Agatha Christie, the queen of Crime.
We rode on the wings of poesy invented by Keats,
Where the world of reality and imagination meets.

Sahid Kshudiram, brave your name,
We carry forward throughout the nation your glowing flame.
For every path now we shall tread,
As our God and Goddess (Sir & Ma'am) have said.

Friends we made, bonds we keep
In heart, they always remain deep.
Our laughter echoed in your open air,
The time stands still when we are here.

So here's goodbye - yet not the end,
For you, at any chance, I'll come to my college friend.

It is not just a college, but a home,
That shaped my soul and my mind and my poem.

Forever you remain beautiful in my memories' light,
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya you are

Great and pure bright...........

The Hands That Held Me

Subhajit Singh
1st Semester, English PG

My dad, you are the person I always pray for,
Without you, I feel lost on an unknown shore.
In this world full of selfishness,
Your Company is my dearest happiness.
I was novice to grab knowledge,
But your wisdom filled my empty pocket.
I can revive those memories on visiting Durga festival,
Where suddenly I said "I'll go abroad by plane."
You said nothing but "ok my son".
I can revisit those memories,
When you used to tell me ghost stories.
One day I demanded a pair of football boots,
And you said nothing but I got my pursuits.
I can memorize the football match played together,
These precious moments will last in my heart forever.
In childhood I showed you my angry side,
But now I can see why you stayed so quite.
I can catch those memories when I become sick,
You and Maa fast and worries run thick.
Yes, I am that person who always made chaos,
But time shaped me to be silent and matured.
Nowadays I talk a little less
But I can peep your silent distress.
Bapi, you are my strength, my inspiration, my endless guide,
I will keep you always close by my side

The Sun and Our Lives

Paramita Sasmal
3rd Semester, English PG

Life is like the Sun, Red-Yellow-Silver
The colours of the Sun are nothing
But various Entities of ours.

The Sun rises, it's Dawn with Red.
As if a Baby has just been born.
Time never waits, starts running.

Colour changes, It's Morning with Yellow.
The Baby grows up in Toddler years.
Spends some time alike, in Yellow Childhood.
Time never waits, starts running.

The Sun takes on new colour once again
The intensity of sunlight increases, Silver.
Childhood passes and Adolescence comes, a teenager.
Remains some time likewise, in Silver until Adulthood.
The glorious, shining, adventurous part is over.

The Sun wants to be like before, Yellow.
Progresses from Adulthood to Middle Age.

The Sun wants to be like before, so Red.
Arrives at old Age, after a long journey.
It is Twilight before Sunset, extremity of Life.
It is pre-death decoration.

Ultimately Sunset, Life is over
Surrounded by Darkness, the reign of Death.

যাদের ইতিহাস হারিয়ে গেছে তাদের কথা তোমরা লেখো

ড. শত্রুঘ্ন কাহার
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

ইতিহাস মানে শুধু রাজবংশের ধারাবিবরণী, যুদ্ধের বিবৃতি বা রাষ্ট্রের নীতি-পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ নয় – ইতিহাস মানে মানুষের জীবনযাত্রার লিপি, শ্রমের স্মৃতি, বেঁচে থাকার সংগ্রাম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইতিহাস চর্চার প্রচলিত ধারা সেই মানুষটিকেই হারিয়ে ফেলেছে – যে মাঠে লাঙল চালায়, কারখানায় ঘাম ঝরায়, শহরের ধুলোমাটিতে রিক্সা টানে বা পাথর ভাঙে। রাজা, বণিক, সাম্রাজ্য ও নেতার গল্পের মধ্যে ঢেকে গেছে সেই অগণিত মুখ – যাদের নীরব পরিশ্রমেই সমাজ টিকে আছে। ইতিহাসচর্চা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার কণ্ঠে বাঁধা থেকেছে; রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠ ডুবে গেছে। আজকের দিনে তাই জরুরি হয়ে উঠেছে ইতিহাসকে মানুষের দিকে ফেরানো – "নিচ থেকে ইতিহাস" (History from Below) রচনার আহ্বান। এই ব্রত কেবল একাডেমিক নয়, এটি মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বও।

আমরা যে সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ বেঁচে আছি, তার ভিত গড়ে উঠেছে এই আপামর জনগণের শ্রম ও রক্তে। অথচ তাদের ইতিহাস অজানা, তাদের স্মৃতি অস্বীকৃত। ইতিহাসচর্চার পৃষ্ঠাগুলিতে তারা প্রায়ই "পরিসংখ্যান" – কিন্তু মানুষ নয়। ফলে ইতিহাস হয়ে উঠেছে একরকম একতরফা আখ্যান, যেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে রাষ্ট্র ও পুঁজির শব্দে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে ইতিহাসে নতুন এক ধারা গড়ে ওঠে – "নিচ থেকে ইতিহাস" (History from Below)। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক E.P. Thompson এই ধারা সূচনা করে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ The Making of the English Working Class (1963)-এ। তিনি বলেন, ইতিহাসের কাজ হলো "to rescue the poor stockinger, the Luddite cropper, the obsolete hand-loom weaver… from the enormous condescension of posterity " । অর্থাৎ, ইতিহাসকে তার প্রকৃত কেন্দ্র -- মানুষের অভিজ্ঞতা ও শ্রমে – ফিরিয়ে আনা। ভারতের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনা আরও গভীর তাৎপর্য বহন করে। কারণ এখানে 'শ্রমিক' ও 'কৃষক'কেবল উৎপাদনশক্তি নয়; তারা সমাজের আত্মা, যাদের ছাড়া ভারত নামের ধারণাই অসম্পূর্ণ।

Thompson ইতিহাসকে রাজনীতি বা অর্থনীতির বাইরে এনে দেখিয়েছিলেন মানবিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। তাঁর মতে শ্রেণি (class) কোনো স্থির কাঠামো নয়; তাঁর মতে – "Class is a relationship, not a thing. Class happens when some men, as a result of common experiences, feel and articulate the identity of their interests as between themselves, and as against other men whose interests are different from theirs." অর্থাৎ শ্রেণি-চেতনা কোনো জন্মগত বা স্থায়ী অবস্থা নয়, এটি সময়ের সঙ্গে গঠিত এক জীবন্ত সামাজিক প্রক্রিয়া। মানুষ তার উৎপাদন-সম্পর্ক, শ্রম, বঞ্চনা ও পারস্পরিক সংযোগের মধ্য দিয়ে শ্রেণি-চেতনা অর্জন করে এবং সেই চেতনা সাংস্কৃতিক রূপে প্রকাশ পায় – ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, ধারণা, গান, আন্দোলন ও সংগঠনের মাধ্যমে। থম্পসন আরও বলেন, যদি আমরা ইতিহাসকে এক মুহূর্তে থামিয়ে দিই, তবে সমাজে শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি থাকবে, কোনো শ্রেণি থাকবে না। কিন্তু আমরা মানুষকে সময় পরিবর্তনের ধারায় দেখি, তখনই বোঝা যায় কীভাবে তারা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে একসঙ্গে চিনতে শেখে, প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় 'শ্রেণি'রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতে এই ধারণা আরও প্রসারিত হয়। কারণ ভারতের শ্রমজীবী সমাজ একরৈখিক নয় – এখানে একই সঙ্গে আছে কৃষক, মজুর, কারখানার শ্রমিক, গৃহকর্মী, নির্মাণকর্মী এমনকি আধুনিক যুগের গিগ-

ওয়ার্কারও। এদের জীবন অভিজ্ঞতা কেবল অর্থনৈতিক নয়, জাতি, ধর্ম, পরিবার, লিঙ্গ ও সংস্কৃতি – সব কিছুর সঙ্গে মিশে গঠিত। ফলে শ্রমের ইতিহাস এখানে একসঙ্গে সমাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। ১৯৮০ এর দশকে Ranajit Guha, Partha Chatterjee, Shahid Amin, David Hardiman, Dipesh Chakrabarty দের নেতৃত্বে যে Subaltern Studies Group গঠিত হয়, তারা ইতিহাসের প্রচলিত জাতীয়তাবাদী ও ঔপনিবেশিক কাঠামোকে প্রশ্ন করে। তাদের মতে, ভারতে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা মূলত শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা – ব্রিটিশ প্রশাসক, ভারতীয় এলিট, বা জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কিন্তু এই ইতিহাসে অনুপস্থিত ছিল সেই মানুষদের কথা, যারা প্রকৃত অর্থে সমাজের চালিকা শক্তি – কৃষক, শ্রমিক, মজুর, নিম্নবর্গ, নারী ও প্রান্তিক জনগণ।

থম্পসনের ধারণার প্রতিধ্বনি আমরা পাই রণজিৎ গুহর Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India-এ। তিনি দেখিয়েছেন, কৃষক বিদ্রোহগুলো কেবল জমির দাবিতে নয়, এক ধরণের নৈতিক চেতনা (moral consciousness) থেকে জন্ম নেয়। ঠিক যেমন থম্পসন ইংল্যান্ডে 'poor stockinger'-এর ইতিহাস লিখেছিলেন, তেমনি রণজিৎ গুহ ভারতের নিঃশব্দ চাষি, বিদ্রোহী সাঁওতাল বা তেভাগা কৃষকের কণ্ঠ ফিরিয়ে এনেছিলেন ইতিহাসে। এই ভাবনার ধারাবাহিকতায় Dipesh Chakrabarty তাঁর Rethinking Working-Class History: Bengal 1890–1940-এ কলকাতার শ্রমিক জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন – যেখানে শ্রমিক কেবল অর্থনৈতিক সত্তা নয়, সে ধর্ম, অভিবাসন ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গঠিত এক সাংস্কৃতিক সত্তা। অতএব, থম্পসনের চিন্তা ভারতের প্রেক্ষাপটে এক নতুন অর্থ পায়। এখানে ইতিহাস মানে কেবল শাসনের ইতিহাস নয়, বরং মানুষের দৃশ্যমান্যতা – কৃষক, শ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক জনগণের আত্মপ্রকাশের দলিল।

ভারতের ইতিহাসচর্চায় দীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। বিপান চন্দ্র বা আর.সি. মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও মধ্যবিত্ত রাজনীতিকে কেন্দ্র করেছেন। কিন্তু সুমিত সরকার তাঁর Modern India (1885–1947) গ্রন্থে দেখান, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল বহুমাত্রিক – এর ভেতরে শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক বিদ্রোহ, বস্তিবাসীর প্রতিবাদ এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ একসঙ্গে কাজ করেছে। ইতিহাসকে যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিকভাবে পড়তে হয়, তবে সেই নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠকে শোনা জরুরি। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির ইতিহাস না লিখলে ইতিহাসের একটি বড় অংশ অন্ধকারে থেকে যায়। Dipesh Chakrabarty তাঁর Rethinking Working-Class History: Bengal 1890–1940 (1989)-এ দেখিয়েছেন, কলিকাতার জুট মিল শ্রমিকেরা কেবল অর্থনৈতিক চাপের অধীন নয় – তাদের জীবনে ধর্ম, জাত, গ্রামীন সংস্কৃতি ও উপনিবেশিক আধিপত্য মিলেমিশে এক জটিল চেতনা গড়ে তোলে। ইতিহাস তাই শুধুই পুঁজিবাদ বনাম শ্রম নয়, বরং সমাজের গভীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতিফলন। বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে, শোষিত শ্রেণি কখনও নীরব ছিল না। নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬২), পাবনা আন্দোলন (১৮৭৩-৭৬), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) – প্রতিটি আন্দোলন ছিল শ্রমিক ও কৃষকের আত্মমর্যাদার প্রকাশ। রঞ্জিত দাশগুপ্ত ও ডি.এন. ধানগারে তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, এই আন্দোলনগুলো কেবল জমির বা মজুরির দাবি নয়; বরং শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজিক ন্যায়ের এক ধারাবাহিক লড়াই। এই আন্দোলনগুলি ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়, মানুষের সংগ্রামই সমাজ পরিবর্তনের মূল শক্তি।

শ্রমিক-কৃষকের ইতিহাস লেখা মানে শুধুমাত্র অতীত জানা নয়, বরং সমাজে ন্যায়বোধ পুনর্নির্মাণ

করা। ডেভিড হার্ডিম্যান তাঁর The Peasant Resistance in India (1992)-এ লিখেছেন, কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে নৈতিক প্রতিবাদের ইতিহাস হিসাবে দেখা উচিত। কারণ প্রতিটি আন্দোলনই মানব মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। অমিয় কুমার বাগচি দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক উভয়ের শোষণ বাড়ে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় প্রতিরোধ। তাই শ্রমিক কৃষকের ইতিহাস লেখা মানে কেবল অতীত উদ্ধার নয়; বরং ভবিষ্যতের সমাজ চেতনার ভিত্তি গড়ে তোলা। লোককাহিনী, গান ও মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক শ্রেণি তাদের স্মৃতি সংরক্ষণ করেছে। এইসব লোক সাহিত্যের উৎস ইতিহাস চর্চার বিকল্প দলিল হতে পারে — যা আমাদের জানায়, ইতিহাসের গভীরে রয়েছে মানুষের যন্ত্রণা, হাসি ও প্রতিবাদের ভাষা।

আজকের বিশ্বায়ন ও উদারনীতির যুগে শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণির ওপর বহুমুখী আক্রমণ নেমে এসেছে। বাজারের নীতি, প্রযুক্তির আগ্রাসন, জমি-অধিগ্রহণ, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা — সব মিলিয়ে তাদের জীবন আবারও প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র ও পুঁজির এই যৌথ চাপ শুধু অর্থনীতিতেই নয়, মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। আজ শ্রমিক ও কৃষকের বাস্তব সংগ্রামকে রাষ্ট্র ও পুঁজির মিশ্র প্রভাব সযত্নে চেপে দিতে চাইছে — যাতে শ্রমিক ও কৃষকের বাস্তব সংগ্রামকে রাষ্ট্র ও পুঁজির মিশ্র প্রভাব সযত্নে চেপে দিতে চাইছে – যাতে সমাজের চোখে তাদের লড়াই অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষকে প্রতিদিন reels, shorts ও ভ্রান্ত তথ্যের ভেতর নিমজ্জিত করে 'দৃশ্যের দুনিয়া'য় আবদ্ধ করা হচ্ছে, যেখানে বাস্তব জীবনের কষ্ট ও সংগ্রামের জায়গা নিচ্ছে কৃত্রিম উত্তেজনা ও আবেগ নির্ভর ইতিহাস। এই 'WhatsApp University'-র যুগে বিকৃত ও সাজানো ইতিহাসকে 'জাতীয় গৌরব' বলে প্রচার করা হচ্ছে, আর প্রকৃত ইতিহাস অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, নারী ও প্রান্তিক সমাজের সংগ্রাম ধীরে ধীরে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র এই সাংস্কৃতিক বিভ্রমকেই ব্যবহার করছে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে। যখন মানুষ বাস্তব ইতিহাস ভুলে যায়, তখন ক্ষমতার ইতিহাসই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই আজ সাধারণ মানুষের ইতিহাসকে পরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলা হচ্ছে, যাতে শ্রম, দারিদ্র ও প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায় শোরগোলপূর্ণ ভুয়ো ইতিহাসের নিচে।

বর্তমান ভারতে ইতিহাসচর্চা এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। ''Indian Knowledge System'' -এর নামে একদিকে অতীতকে একরৈখিক, গৌরবময় ও পুরাণনির্ভর রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে, অন্যদিকে সমাজের বাস্তব ইতিহাস — শ্রম, সংগ্রাম ও মানবিকতার ইতিহাস — ক্রমশ প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আজ গবেষণার নামে কোথাও মসজিদের ভেতরে মন্দিরের সন্ধান চলছে, কোথাও ইতিহাসচর্চা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বদলে ধর্মীয় আবেগে পরিচালিত হচ্ছে। শিবাজি বা শম্ভাজির মতো ঐতিহাসিক চরিত্রদের ঘিরে আবেগতাড়িত জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা হচ্ছে, ফলে প্রকৃত মানব ইতিহাসের আবেগের তীব্রতায় ঢেকে যাচ্ছে। এইভাবে ইতিহাস ক্রমে পরিণত হচ্ছে এক রাজনৈতিক উপকরণে, যার উদ্দেশ্য মানুষকে তার বাস্তব অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। শ্রমজীবী, কৃষক, দলিত ও প্রান্তিক সমাজের ইতিহাস মুছে দিয়ে এমন এক ভ্রান্ত চিত্র তৈরি করা হচ্ছে যেন ভারত কেবল রাজা, ধর্ম ও বীরত্বের ইতিহাস। এই পরিস্থিতে ইতিহাস চর্চার প্রকৃত কাজ হলো সেই নীরব, কিন্তু অপরিহার্য মানুষের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা — যে ইতিহাস শ্রমের, মাটির, প্রতিরোধে এবং মর্যাদার। ইতিহাস তখনই জীবন্ত, যখন তা মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়; আর ইতিহাস চর্চা তখনই অর্থবহ, যখন তা নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বরকে উচ্চারণে সুযোগ দেয়। আজকের দিনে তাই একজন ইতিহাসের ছাত্রের পরম কর্তব্য হল – এ আপামর জনগণের, এই নিঃশব্দ শ্রমিক-কৃষকের, এই অসংগঠিত

ও অদৃশ্য শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাসের চেতনা জাগিয়ে তোলা; কারণ ইতিহাস তখনই জীবন্ত, যখন তা মানুষের পক্ষে কথা বলে। রণজিৎ গুহের মতে ‘History has to speak for those who could not speak for themselves. ’ অর্থাৎ ইতিহাসকে তাদের পক্ষেই কথা বলতে হবে, যারা নিজের পক্ষে কথা বলতে পারেনি।

গ্রন্থ সহায়তা ঃ

1. Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz, 1963.

2. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: OUP, 1983.

3. Chakrabarty, Dipesh. Rethinking Working-Class History: Bengal 1890–1940. Princeton, 1989.

4. Sarkar, Sumit. Modern India 1885–1947. Delhi: Macmillan, 1983.

5. Hardiman, David. The Peasant Resistance in India. Delhi: OUP, 1992.

6. Bagchi, Amiya Kumar. The Political Economy of Underdevelopment. Cambridge University Press, 1982.

7. Dhanagare, D. N. Peasant Movements in India: 1920–1950. New Delhi: Oxford University Press, 1983.

8. Dasgupta, Ranjit. Tebhaga Movement in Bengal. Calcutta, 1992.

9. Chandra, Bipan, et al. India's Struggle for Independence. New Delhi: Penguin Books, 1989.

স্বপ্ন দেখার সাহস ও বাস্তবায়নের কৌশল

ড. গোবিন্দ দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের জীবনের এই গঠনমূলক পর্যায়ে আমি একটি মৌলিক সত্য ভাগ করতে চাই, যা প্রতিটি তরুণ হৃদয়ের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ - স্বপ্ন। স্বপ্ন শুধুমাত্র রাতের ঘুমে দেখা কোনো অলীক দৃশ্য নয়, বরং তা হলো জীবনের সেই প্রাণশক্তি যা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় অসাধ্য সাধনের পথে। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ড.এ.পি.জে. আব্দুল কালামের কথায় – 'Dream is not that which you see while sleeping; it is something that does not let you sleep'। স্বপ্ন দেখার সাহস এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল – এই দুইয়ের সমন্বয়েই রচিত হয় সফলতার প্রকৃত গল্প। আজকের যুগে যখন প্রতিযোগিতা তীব্র, সুযোগ সম্ভাবনা সসীম এবং চ্যালেঞ্জ বহুমুখী, তখন তোমাদের জানা প্রয়োজন কীভাবে স্বপ্নকে শুধু মনের কোণে লালন না করে, তাকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে প্রোথিত করতে হয়।

স্বপ্ন দেখার সাহস অর্জন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। সমাজ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, এমনকি নিজের মনও অনেক সময় আমাদের বাধা দেয় বড় কিছু ভাবতে। 'উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ। ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ' – উদ্যম দ্বারাই কাজ সিদ্ধ হয়, কেবল মনোরথ দ্বারা নয়, খাদক ঘুমন্ত সিংহের মুখে খাদ্যরূপে হরিণ কখনই এসে পড়ে না। এই নীতিবাক্যটি আমাদের শেখায় যে, স্বপ্ন দেখাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন প্রবল উদ্যম ও কর্মতৎপরতা। প্রথমত, তোমাদের স্বপ্ন হতে হবে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। অস্পষ্ট লক্ষ্য কখনোই তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারবে না। যেমন একজন তীরন্দাজ যদি লক্ষ্যবস্তু দেখতে না পায়, তবে তার তীর কখনো সঠিক স্থানে পৌঁছাবে না। দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন দেখার সাহস মানে ব্যর্থতার ভয়কে জয় করা। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সব মহান মানুষই একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা থেমে যাননি। তৃতীয়ত, নিজের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে। যখন সবাই তোমার স্বপ্নকে উপহাস করবে, তখন একমাত্র তোমার আত্মবিশ্বাসই তোমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই তো ঋষি বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি' - নিজেকে জানো, নিজের শক্তিকে চিনে নাও; কারণ নিজেকে চিনতে পারলেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারবে। তোমার স্বপ্ন তোমার নিজস্ব, এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও একান্তভাবে তোমার। আবার বাস্তবায়নের পথে হয়তো হাজারো বাধা আসতে পারে, কখনো তোমায় একলা চলতে হতে পারে, তখন স্মরণ করবে – 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' এই একলা চলার সাহসই হল স্বপ্ন দেখার প্রকৃত শুরু। সমাজ প্রায়ই নতুন ভাবনা ও সাহসী পদক্ষেপকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু ইতিহাস বলে, - যাঁরা পৃথিবীকে বদলেছেন, তাঁর সকলেই প্রথমে একা ছিলেন। একলা চলার পথে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান সদাই স্মরণীয় - 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' (ওঠো, জাগো, জ্ঞানের আলোক গ্রহণ করো)। এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনযুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা নয়, কর্মই সমস্ত বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তির পথ।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের যাত্রা শুরু সঠিক পরিকল্পনা থেকে। 'যথা চিত্তং তথা বাচঃ, যথা বাচস্তথা ক্রিয়া' - মন যেমন, কথা তেমন; কথা যেমন কাজও তেমন হওয়া প্রয়োজন। এই ঐক্যতান তোমার জীবনে থাকা অপরিহারার্য। প্রথম কৌশল হলো তোমার বৃহৎ স্বপ্নকে ছোট ছোট লক্ষ্যে ভাগ করা। যে পর্বতে একলাফে ওঠা অসম্ভব, সেই পর্বতেই ধাপে ধাপে পা ফেলে পৌঁছানো সম্ভব। প্রতিটি ছোট লক্ষ্য অর্জন তোমাকে দেবে আত্মবিশ্বাস এবং এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। দ্বিতীয় কৌশল হলো সময় ব্যবস্থাপনা। তোমার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন, 'কাল এব পরমং বলম্' – সময়ই পরম শক্তি। যারা সময়কে সম্মান করে ও যথাযথ কাজে লাগায়, সময়ও তাদের যথাযথ সম্মান করে এবং ফলও দেয়। একটি দৈনিক রুটিন তৈরী করো যেখানে তোমার পড়াশোনা, দক্ষতাবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, বিশ্রাম, খেলাধূলা ও সোশ্যাল মিডিয়া – সব কিছুর জন্যই

নির্দিষ্ট সময় থাকবে। তৃতীয় কৌশল হলো নিরন্তর জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও আত্মোন্নয়ন। পৃথিবী প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে, নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি যোগ হচ্ছে। তোমাকে হতে হবে আজীবন শিক্ষার্থী। বই পড়ো, নতুন দক্ষতা শেখো, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে কথা বলো। জ্ঞানই একমাত্র সম্পদ যা তোমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। চতুর্থ কৌশল হলো সঠিক সঙ্গ নির্বাচন। 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' – সংসর্গ থেকেই কামনার উৎপত্তি। তোমার চারপাশের মানুষেরা তোমার চিন্তাভাবনা, মনোভাব এবং কর্মপদ্ধতিকে প্রভাবিত করবে। যারা ইতিবাচক, লক্ষ্যভিত্তিক এবং পরিশ্রমী, তাদের সাহচর্য তোমাকে উজ্জীবিত করবে। বিপরীতে, নেতিবাচক মানসিকতার মানুষেরা তোমাকে টেনে নামাবে।

পঞ্চম কৌশল হলো, ধৈর্য ও অধ্যাবসায়। রাতারাতি সাফল্য আসে না। 'ক্ষণশঃ কণশশ্চৈব বিদ্যামর্থং চ সাধয়েৎ' – ক্ষণে ক্ষণে, কণায় কণায় বিদ্যা ও অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিদিনের ছোট ছোট প্রচেষ্টাই একদিন বিশাল সাফল্যে পরিণত হয়। হতাশা আসবে, বাধা আসবে, কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে অবিচল। মনে রাখবে, ঝড়ের পরেই আসে প্রশান্ত সূর্যালোক। ষষ্ঠ কৌশল হলো ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। প্রতিটি ব্যর্থতা তোমার শিক্ষক। বিশ্লেষণ করো কী ভুল হয়েছে, কোথায় উন্নতি প্রয়োজন এবং পরবর্তী প্রচেষ্টায় সেই জ্ঞান প্রয়োগ করো। ব্যর্থতা তোমার শত্রু নয়, বরং সাফল্যের সিঁড়ির একটি ধাপ মাত্র।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা তোমাদের জানা আবশ্যক। প্রথমত, স্বাস্থ্যের যত্ন নাও। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' – শরীরই ধর্ম সাধনের প্রথম উপায়। সুস্থ শরীর ছাড়া তুমি তোমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিতে পারবে না। নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম আহার এবং পর্যাপ্ত ঘুম তোমার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করো। ধ্যান, যোগ বা যে কোনো মানসিক সুস্বাস্থ্যের অনুশীলন তোমাকে দেবে মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা। তৃতীয়ত, কৃতজ্ঞতা চর্চা করো। যারা তোমাকে সাহায্য করছে, অনুপ্রাণিত করছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। কৃতজ্ঞতা তোমার মনকে ইতিবাচক রাখে এবং আরও ভালো সম্পর্ক তৈরী করতে সাহায্য করে। চতুর্থত, নমনীয়তা রাখো। পরিকল্পনা করো দৃঢ়ভাবে, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই পরিকল্পনা পরিবর্তনে প্রস্তুত থাকো। জীবন সর্বদা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে না, কিন্তু যারা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তারাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বর্তমান সময়ে সর্ববিধ প্রতিকূলতা অত্যন্ত প্রকট; তথাপি আমি বলতে পারি, তোমাদের সামনে রয়েছে অসীম সম্ভাবনার এক নতুন যুগ। তোমরা যে স্বপ্নই দেখো না কেন – গবেষক হওয়ার, শিক্ষক হওয়ার, শিল্পী হওয়ার, উদ্যোক্তা হওয়ার, সমাজসেবক হওয়ার, খেলোয়াড় হওয়ার, ইত্যাদি যা কিছু হওয়ার – মনে রাখবে, 'যদ্ ভাবো তদ্ ভবতি' – যা ভাবনা, তাই হওয়া। তোমার চিন্তাই তোমার বাস্তবতা তৈরী করে। তাই স্বপ্ন দেখো বড়, ভাবো গভীরভাবে এবং কাজ করো নিরলসভাবে। জীবনে বাধা আসবে, সমালোচনা আসবে, হতাশা আসবে – কিন্তু তোমার দৃঢ়তা, পরিশ্রম এবং বিশ্বাস তোমাকে অবশ্যই তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আমি তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপার সম্ভাবনা দেখি। তোমরা শুধু ভবিষ্যতের নাগরিক নও, তোমারাই ভবিষ্যতের স্রষ্টা। তোমাদের স্বপ্নই একদিন আমাদের সমাজ, দেশ এবং বিশ্বকে নতুন দিশা দেবে। তাই সাহসের সঙ্গে স্বপ্ন দেখো, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করো এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করো। তোমাদের সফলতাই আমাদের প্রকৃত পুরস্কার। মনে রাখবে, স্বপ্ন পূরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ব্যর্থতার ভয়। অথচ ব্যর্থতা কখনও পরাজয় নয়, বরং এক নতুন শিক্ষা। থমাস এডিসন বলেছিলেন – 'I have not failed, I have just found ten thousand ways that won't work. ' গীতায় বলা হয়েছে - 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। যে স্বপ্নকে লক্ষ্য করে অবিরাম পরিশ্রম করে, তার ব্যর্থতা কেবল সাফল্যের পূর্বাভাস। তাই কর্ম করে যাও নিষ্ঠার সঙ্গে, সফলতা অবশ্যই আসবে। তোমাদের জীবনযাত্রা হোক আলোকিত, তোমাদের স্বপ্ন হোক বাস্তবায়িত – এই আমার প্রত্যাশা।

মনসাপুজো ও কিছু কথা

অভিষেক মুসিব
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মনসা পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার গ্রাম বাংলায় অতি ধুমধামের সঙ্গে এই পুজো হয়ে থাকে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক-উৎসব হল মনসাপূজা ও ঝাঁপান পরব। জলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ লাল মাটি এলাকায় ও কৃষিক্ষেত্রে সাপের উপদ্রব ও সর্পাঘাত থেকে রক্ষার জন্য বিষহরী দেবী মা মনসার পুজো করা হয় শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। পরের দিন ১লা ভাদ্র শুরু হয় গুণীনদের সর্পক্রীড়া প্রদর্শনী তথা ঝাঁপান। মনসা পুজোর পরের দিন পালিত হয় অরন্ধন তথা পান্তাভাত উৎসব। এই দিন বিভিন্ন এলাকায় ঝাঁপান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখন আর আগের মতো সাপ খেলা দেখা যায় না এবং সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঝাঁপানের গানগুলিও। এই শ্রাবণ মাসের মনসা পুজোর সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে গ্রাম বাংলার শস্য রোপন ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মিথ। একটি আর্কিটাইপের উদাহরণ হল জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম আর্কেটাইপ পুনরাগমন চক্র। এই আর্কিটাইপটি উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত। পুনরুজ্জীবন, সব সভ্যতার Birth-Death-Rebirth এটি হল আদিটাইপ, একে অনেকগুলি গল্পের মধ্যে দেখা যায় যথা ভারতের বাইরে মিশরীয় পুরাণে ওসিরিস ও আইসিসির গল্প, সুমেরু ও বাবলনীয় পুরাণে তম্মজ ও ইসথারের কাহিনী, গ্রীক পুরাণে পার্সিফেনো ও ডিমিটার -এর গল্প, প্রায় সবকটি গল্পেই একটি আর্কেটাইপ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল একবার প্রাণ চলে যাওয়া আবার সক্রিয় সহচর্যে প্রাণের পুনরুজ্জীবন। চোখের সামনে থেকে একবার শস্য চলে যাওয়া, আবার মাটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের পর তা ফিরে আসা। অর্থাৎ মাটি হল সেই নারী যে শস্যকে অদৃশ্য করে আবার পুনরায় তাকে ধরিত্রীর বুকে নিয়ে আসে। এখানে মাটিকে নারীর সঙ্গে সমান্তরাল করে দেখা হয়। উল্লেখিত প্রতিটি গল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত দেবতার প্রাণ ফিরে এসেছে তাঁর প্রিয়া কিংবা অন্য কোন প্রিয়জনের চেষ্টায়। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গলের বেহুলা লখিন্দর কাহিনীর মধ্যে দেখি বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে হয়, বিয়ের রাত্রে বাসর ঘরে অতন্দ্র পাহারা সত্ত্বেও লখিন্দরকে কালনাগিনীর দংশন এবং বেহুলার বৈধব্যলাভ। চম্পকনগরবাসী চোখের জলে বিদায় দেয় লখিন্দর ও বেহুলাকে গাঙুরের ঘাটে। কলার ভেলায় চড়ে মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা অনির্দেশ যাত্রার পথে পাড়ি দেয়। পথিমধ্যে অশেষ দুঃখ কষ্ট সয়ে স্বামীর কঙ্কালসার দেহ নিয়ে স্বর্গের দ্বারে উপনীত হয়। নেতা ধোবানীর সহায়তায় স্বর্গের আসরে নাচে-গানে দেবতাদের মুগ্ধ করে তাঁদের অনুরোধে মনসার কৃপায় বেহুলা দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁর মৃত স্বামীর জীবন পুনরুদ্ধার করে ও শ্বশুরের সব হৃত সম্পদ ফিরে পায়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই ধরণের সমজাতীয় উপাখ্যান এবং সেই উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত ধর্মাচারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে কাহিনীর মূল প্রেক্ষিতকে বোঝা যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা - লখিন্দরকে একজন নারী ও পুরুষ প্রতিভূরূপে দেখলে দেখা যাবে এই কাহিনী প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার শস্য উৎপাদন ও উর্বরতা বৃদ্ধির ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গলে দেখা যায় বেহুলা মনসার পূজা করে অর্থাৎ বেহুলা হল সেই সমাজের নারী যে সমাজে নারীরা এই দেবতার প্রতি বিরূপ নয়। আদিমকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা দেবতার পূজা বহন করত এবং পুরুষরা মেয়েদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মেয়েরাই ছিল ধর্মকর্মের ব্যাপারে হোতা। যে সমস্ত দেশে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা পার হয়ে গেছে সেই সমাজের পৌরাণিক বা রূপকথার গল্প বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেই সমাজে যে দেবী পূজিতা হতেন তিনি হলেন উর্বরতার দেবী বা মাতৃকা দেবী। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় উর্বরতা পূজার সময় পুরুষদের যে ভূমিকা তা নারীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে শস্যের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ যাদুক্রিয়ার প্রভাবে কোনো না কোনো পুরুষ দেবতা স্ত্রী দেবতার দ্বারা মৃত হত এবং তারই সহচর্যে পুনর্জন্ম লাভ করত বা প্রাণের

রূপান্তর হত। মনসা মঙ্গল কাব্যে বেহুলা এমন একজন নারী যে বিবাহের রাত্রে স্বামীর প্রাণ হরণ করে আবার তারেই দৃঢ় সংকল্প ও অসীম সাহসিকতার জোরে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ বেহুলা একদিকে প্রাণঘাতিনী আবার প্রাণদায়িনীও।

প্রাচীন সভ্যতায় জমির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, দুজনেই যা নেয় তা নির্দিষ্ট সময় পরে আবার ফিরিয়ে দেয়। জমির মধ্যে বীজ বপন করা হয়, অর্থাৎ সে ধরিত্রীর অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করে, আবার কিছুদিন পর সেখানেই সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। জমি যেমন ফসলের জন্ম দেয় তেমনি নারীও সন্তানের জন্ম দেয়। এই দিক দিয়ে জমি ও নারীকে সমান্তরাল ভাবা হত। বেহুলা লখিন্দরের গল্পে সেই জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ছক আবর্তিত। মনসামঙ্গল গল্পের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক যে খুব নিবিড় তার কতকগুলি প্রমাণ পাই –

১। বেহুলা যখন লখিন্দরকেকে ভেলায় নিয়ে ভেসে যায়, তখন সে মাটিতে কিছু বীজ পুঁতে দেয়। বিশ্বাস ছিল যদি এই বীজগুলি থেকে অঙ্কুর বের হয় তাহলে বুঝতে হবে লখিন্দরের প্রাণ বেঁচে আছে। অর্থাৎ মৃত লখিন্দরের প্রাণের প্রতীক হল ঐ বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ।

২। কাহিনীতে লখিন্দরের মৃত্যু থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত সময় ছয় মাস। আমরা দেখি জমিতে বীজ বপন থেকে ফসল কাটা অর্থাৎ শস্যের আবর্তনকালীন প্রক্রিয়াও ছয়মাস।

৩। গ্রামাঞ্চলে বেহুলার ভাসান গান গাওয়া হয় যখন জমিতে শস্য রোপন করা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস শস্য (ধান প্রধান কৃষিজ ফসল) বীজ বপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

৪। গ্রাম্য বিশ্বাস অনুযায়ী বেহুলার গান টানা বা এক নিঃশ্বাসে গাওয়া হয়, যদি গান চলাকালীন মাঝখানে বাধা পড়ে তাহলে মনে করা হয় ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

৫। গ্রাম বাংলার আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে জিয়ূড় মনসাপুজো হয়ে থাকে। ওই দিন সবাই জমির ফসলের সাধ অনুষ্ঠান এর জন্য বাড়িতে বাড়িতে পুজোর আয়োজন করে থাকে এবং সেই নৈবদ্য জমিতে দিয়ে আসে।

শস্যপ্রাণের সঙ্গে পুরুষ প্রাণের সমান্তরালতা অতীত কালেও ছিল, বেহুলা লখিন্দরের গল্পেও আছে। এখানে শস্যের প্রাণপ্রতীক হল লখিন্দরের প্রাণ। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী সর্পপূজার সঙ্গে যত না বেশি সম্পর্কিত তার চেয়ে অনেক বেশি বাংলার শস্য উর্বরতা ও ফসলের সঙ্গে বেশিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আরেকটি পরিচিত দৃশ্য হল চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনী দৃশ্য। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে কমলেকামিনী দৃশ্যে দেখা যায় ধনপতি সিংহলে সপ্তবহর সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রার সময় কালীদহে দেবী চণ্ডীর মাথায় দেখতে পান পদ্মে উপবিষ্টা এক অপূর্ব সুন্দরী নারী একবার হস্তী গ্রাস করছে, আবার পরমুহূর্তেই বের করে আনছে। ধনপতির মতো শ্রীমন্তও কালীদহে একই দৃশ্য দেখেন। চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনীর দৃশ্যের বর্ণনায় জোর দেওয়া হয়েছে রমণীর সৌন্দর্যের ওপর । কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দৃশ্যটিকে বিচার করলে বলা যায় এক মহিলা একটি হাতীকে উদরসাৎ করছেন আবার পরমুহূর্তে তাকে বের করে আনছেন, এই অভিনব দৃশ্যটি কোনো সৌন্দর্যতাকে বহন করে আনে না। দৃশ্যটির মধ্যে সুন্দরী নারী ও হাতিটিকে সরিয়ে যদি মূল প্রেক্ষিতটি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে এখানে এক নারী কর্তৃক প্রাণ হনন ও প্রাণের পুনর্জন্ম ঘটছে অর্থাৎ জিঘাংসাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মনসামঙ্গলের মতো এখানেও বাংলার লোকমোটিফের প্রাণ নেওয়া এবং ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। পুরানে যে গজলক্ষ্মীর ছবি পাওয়া যায় সেখানে দেখি হাতীর শুঁড় মা লক্ষ্মীর মাথায় জল সিঞ্চন করছে এবং লক্ষ্মী তার দ্বারা উর্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শস্য উৎপাদন করছে। পুরাণে গজলক্ষ্মী খুব ইঙ্গিতপূর্ণ যা কৃষি ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক পুরাণ, যাযক এবং ভারতীয় মিথে পাওয়া যায় হাতি উর্বরতার প্রতীক। প্রচলিত লোকগল্পে পাওয়া যায় আকাশ থেকে শ্বেতহস্তী নেমে আসে এবং তার প্রভাবে মায়াদেবী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তারপর সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। আসলে এখানে হাতিটিকে পুরুষ প্রাণের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। হাতিটিকে পুরুষ প্রাণের প্রতীক হিসাবে ধরলে কমলেকামিনী দৃশ্যে বলা যায় যে একজন নারীর দ্বারা একটি পুরুষ প্রাণ হারাচ্ছে ও পুনরায় জন্ম নিচ্ছে যা মনসামঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে মেলে।

মূল্যবোধহীন শিক্ষা ঃ এক অর্থহীন আলো

গোপাল সেনাপতি
অধ্যাপক, এডুকেশন বিভাগ

শিক্ষা মানবজীবনের আলোকবর্তিকা – এমনটি আমরা প্রায়ই বলি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, আজকের শিক্ষার আলো আসলে কাকে আলোকিত করেছে ? মস্তিষ্ককে না হৃদয়কে ? আধুনিক শিক্ষা মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি – সব দিক থেকেই এগিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু নৈতিকতা, চরিত্র, মূল্যবোধের দিক থেকে আমরা কি সত্যিই অগ্রসর হচ্ছি ? না, বরং ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। আজকের সমাজে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু মানুষ ক্রমে কমে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা, ভোগবাদ ও অর্থলোভে আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে সাফল্যের মাপকাঠি হল কেবল সম্পদ ও পদমর্যাদা। অথচ প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য তো মানুষ তৈরী করা। মানুষ, যে জানে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সততা। এই শিক্ষার অভাবেই আজ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকার।

'মূল্যবোধ' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের মৌল গুণাবলী – স্নেহ, মমতা, সততা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ। এগুলি কেবল বই থেকে শেখা যায় না। এগুলি শেখানো যায় আচরণের মাধ্যমে। রুশো যেমন তাঁর এমিল গ্রন্থে বলেছিলেন –'শিক্ষা মানে শিশুকে প্রকৃতির নিয়মে মানুষ করে তোলা।' আজ সেই মানবিক শিক্ষাই হারিয়ে গেছে। একসময় শিক্ষালয় ছিল মানবিকতার পাঠশালা। শিক্ষক ছিলেন আদর্শের প্রতীক, যাঁদের জীবন থেকেই ছাত্ররা নৈতিকতার পাঠ নিত। কিন্ত এখন শিক্ষকও অনেক সময় প্রক্রিয়ার চাপে পড়া শেষ করার যন্ত্রে পরিণত হচ্ছেন। আর ছাত্ররা শেখে শুধু কীভাবে ভালো মার্কস পাওয়া যায়, কেমন করে দ্রুত চাকরি পাওয়া যায়। মানবিকতা, সমাজবোধ, দায়বদ্ধতা — সবই যেন ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে গেছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মূলত বস্তুবাদী সমাজের চাহিদা মেনে চলছে। এখানে প্রতিটি ছাত্রকে প্রস্তুত করা হচ্ছে 'পেশাজীবী' হিসাবে, কিন্তু 'মানুষ' হিসাবে নয়। নৈতিকতা বা সততা আজ অনেকের কাছে দুর্বলতার প্রতীক। ফলে সমাজে তৈরী হচ্ছে শিক্ষিত কিন্তু অমানবিক এক প্রজন্ম — যারা জানে কেমন করে যন্ত্র বানাতে হয়, কিন্তু জানে না কেমন করে মানুষ হওয়া যায়।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে মানুষের মধ্যে আসছে নানা অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন। সমাজ ও পরিবারে বেজে উঠছে ভাঙনের সুর। নষ্ট হচ্ছে পবিত্র সম্পর্কগুলি। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশী। ফলে বেড়ে চলেছে আত্মহত্যা সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও

বন্ধু-বান্ধব সহ সম্পর্কের এমন নির্ভেজাল জায়গাগুলিতে ফাটল ধরেছে। আজ বর্তমান বিশ্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের অসম প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে মানুষে মানুষে দূরত্ব। ব্যক্তিজীবনে কমে আসছে ধৈর্যশীলতা। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার লোভও বিরাজ করছে মাত্রাতিরিক্ত। দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার ক্রমেই ধাবিত হচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। একজন মানুষের চরম নৈতিক মূল্যবোধের ধাক্কায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে অন্য মানুষ। তৈরী হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। এককথায় দিন দিন মানুষের মানসিক বিকৃতি বাড়ছে। হতাশা বা অস্থিরতা বিরাজ করছে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে বেঁচে থাকার প্রতিটি ধাপে। মায়ামমতা, স্নেহ ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ পাশবিক হয়ে উঠেছে। এই শিক্ষার ফলেই আমরা দেখছি শিক্ষিত দুর্নীতিবাজ, প্রতারক ব্যবসায়ী, স্বার্থান্বেষী নেতা। সমাজে আজ যে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধনের টানাপোড়েন আর আত্মকেন্দ্রিকতার আগ্রাসন – সবই এই মূল্যবোধহীন শিক্ষার দান। শিক্ষার আলো কেবল মগজে পৌঁছাচ্ছে, হৃদয়ে নয়।

তবু হতাশার কিছু নেই। সমাজে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা শিক্ষা দিয়েই পরিবর্তন করা সম্ভব। কারণ শিক্ষা কেবল চাকরি পাওয়ার মাধ্যম নয়, জীবনের সঠিক দিশা খোঁজার উপায়ও বটে। যখন শিক্ষা মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলে, তখনই সে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ ও মানবতার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে।

একজন শিক্ষক যদি কেবল পাঠদানের সীমা পেরিয়ে আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠেন, তবে তার ছাত্ররাও সেই আদর্শে আলোকিত হয়। শিক্ষকের জীবনযাপন, কথাবার্তা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি – সব কিছুই ছাত্রদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাই শিক্ষকই হতে পারেন পরিবর্তনের প্রথম দিশারী। অন্যদিকে, শিক্ষার বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আনতে হবে। যদি প্রতিটি পাঠে মানবিকতা, সহানুভুতি, সততা, প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও সমাজ সেবার মূল্যবোধ যুক্ত হয় – সেই দিকেই নজর দিতে হবে। শিক্ষাকে আরও কার্যকর করতে হলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখার সুযোগ তৈরী করতে হবে। গাছ লাগানো, আশেপাশের মানুষকে সাহায্য করা, দলগত দায়িত্ব নেওয়া – এইসব বাস্তব গাজের মাধ্যমেই ছাত্ররা নৈতিকতার বীজ রোপন করতে শেখে। বইয়ের পাতায় নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

কোনো বিষয় ভালোভাবে শেখানো মানে শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ধারণা, ক্রমিক গঠন এবং পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়সংযুক্ত মূল্যবোধগুলিকে আত্মস্থ করতে পারে তা দেখা। মানবিক এবং ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয় উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরী। যে পাঠ-একক উদ্দীপনা সৃজন করে, ধনাত্মক অনুভূতি জাগরণ করে, আত্ম সংবোধনে সাহায্য করে, খোলা মনে জিজ্ঞাসার মানসিকতাকে উদ্দীপ্ত করে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করে তা মূল্যবোধসম্পন্ন এবং অর্থপূর্ণ বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধ সঞ্চালনে প্রশ্ন করা, গল্প বলা, খেলাধূলা, পরীক্ষণ, আলোচনা, কথোপকথন, উদাহরণ দান, চরিত্রায়ণ, ভূমিকায়ন প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়।

'মূল্যবোধ শিক্ষা' এর এক অর্থে আমরা শিশুদের মধ্যে মানবতাবাদের উন্মেষের শিক্ষার কথা বলতে পারি যা অন্যের এবং জাতির শুভের প্রতি গভীরভাবে ভাবিত হয়। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রোথিত করতে পারি যা এই দেশ তথা জাতিকে শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়ে দেবে এবং কাজের প্রতি অহংকারকে জাগিয়ে তুলবে যা নিয়মনীতি, নিরাপত্তা ও প্রগতিকে নিশ্চিত করবে।

আজ আমরা এমন এক যুগে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে বিদ্যা আছে, কিন্তু বিবেক নেই, জ্ঞান আছে, কিন্তু মানবতা নেই। অথচ শিক্ষা মানে কেবল তথ্যের সঞ্চয় নয়, জীবনের বোধ অর্জন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন — 'শিক্ষার ফল হলো স্বাধীন মানুষ'। সেই স্বাধীনতা মানে কেবল বাইরের নয় অন্তরের মুক্তিও। যখন শিক্ষা মানুষকে লোভ, হিংসা, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে শেখায়, তখনই তা প্রকৃত শিক্ষা হয়।

Honking Horns

Bholanath Das
Faculty, Dept .of English

One of the B.Ed examinees, when I was on exam invigilation duty, humbly hinted at me to leave out the examination room for a while so that the answers can be managed, stuffed in the deep pockets. Well, it might have punctured the pride of a community, nonetheless the situation be spoken as it is often found in civil society. An incident, surfacing in the social media that villagers in a neighbouring state are shovelling out the pitch road, just being constructed by the workers and putting them in their home yard, is not what a nation is dreaming for. That B.ed examinee was in the late 40s. However, when you know there is no way out in the heavily crowded traffic, your horns, I mean not your head's horns, your vehicle's horns keep on honking as if you are rushing to turn the mountains upside down. And then on your way you find the lights on at 12 at noon, at a juncture at District Magistrate bungalow road. Conscience speaks for stopping and turning off though you speed past. I once wrote to the office why these tap calls, street lights remain on all day. Reply still awaiting from their end. Later, it was found that Mr. Roy, the horn man whirling out puffs of cigar in front of the Girls' Hostel. Let him have that!

Not everything has died down at this hour. Not to be surprised, at the busy bus stand, a girl in her late teens was helping the old tattering man, to cross the busy road and got him seated in the waiting room. By the entrance, she was found to be picking up the Sprite bottle and dropping it down in the litter box. Water is everywhere, just turn on and flush in the public washrooms. From Chicago to New Delhi on air, causing national embarrassment, a passenger flushed plastics and rags into toilets which cause plumbing to fail. After inauguration programmes be it your school's Freshers' Welcome programme or Indian Railways Flagging off train, eaten plates, plastics, bottles, flying everywhere, even there are dustbins. No rhetoric, incidents are penned down as they are. You are a part of this crowd, not to be laughed at. Fostering community action is a means of instilling an order in human beings. Education in the institutions is not just accumulation of facts; it has to be enlightenment of conscience. If an injured man by the road does not awaken our conscience for immediate help, then what it is we are heading for? Together let's stain out the spitting walls.

Children of Earth, Children of the Stars: The Forgotten Blueprint of Human Origins.

Soumya Chakraborty
Faculty, Dept. of Computer Science

Introduction

For over a century and a half, humanity has lived under the shadow of Darwin's great revelation — that every living being, including humankind, evolved through natural selection. Charles Darwin's The Descent of Man (1871) was a radical departure from the prevailing belief in divine creation. It placed humans squarely within the animal kingdom, describing us as evolved apes who gained intelligence and self-awareness through slow, genetic refinement. Mainstream biology and anthropology have since filled in many details of this evolutionary story — from fossil records of early hominins to genetic sequencing that maps humanity's journey out of Africa. Yet, for all its explanatory power, Darwin's framework leaves lingering mysteries. Why do humans alone possess abstract reasoning, complex language, and the capacity for symbolic art? Why do ancient cultures across the planet preserve memories of sky beings and gods who "descended from the stars"? And why do architectural and linguistic parallels recur among civilizations that were, supposedly, never in contact?

These questions form the heart of this chapter — not to reject evolution, but to ask whether it tells the full story. Across the past century, evidence has emerged from genetics, archaeology, comparative mythology, and even fringe science suggesting that human origins may involve more than blind chance. The discovery that 97% of human DNA was once labelled "junk" because its function was unknown (Ohno, 1972) continues to haunt molecular biology. The hypothesis of "directed panspermia" proposed by Nobel laureate Francis Crick (1981) — that life on Earth may have been deliberately seeded — pushes this question to cosmic scales. Meanwhile, ancient texts from Mesopotamia, Egypt, India, and Mesoamerica describe humanoid visitors who taught humans civilization, writing, and astronomy.

This chapter navigates between the rigor of modern science and the curiosity of mythic memory. It is not a manifesto for alien intervention, but a meditation on human exceptionalism — why we alone reimagine our world and gaze upward in search of our makers.

1. Ape, Alien, or Hybrid? — Reassessing Human Origins

Charles Darwin's The Descent of Man (1871) marked the formal scientific declaration that humans evolved from ape-like ancestors through natural selection. Fossil discoveries since then — from Australopithecus afarensis ("Lucy") to Homo erectus and Homo sapiens neanderthalensis — have built a detailed evolutionary tree (Johanson & Edey, 1981). Molecular biology, particularly mitochondrial DNA analysis, has traced all modern humans back to a common African ancestor roughly 200,000 years ago (Cann, Stoneking, & Wilson, 1987). Yet, even with this elegant genetic map, significant questions remain unanswered.

One of the most provocative mysteries concerns the human genome itself. Only about 1.5% of our DNA encodes proteins; the rest — roughly 97% — was long dismissed as "junk DNA" (Ohno, 1972). However, recent findings suggest that this noncoding DNA plays crucial regulatory and structural roles (ENCODE Project Consortium, 2012). Some researchers, such as Makukov and Shcherbak (2013), have controversially argued that noncoding sequences exhibit patterns suggestive of intelligent encoding. Their paper, published in Icarus, speculated that such signatures could represent an artifact of ancient genetic engineering — a hypothesis that remains speculative but has fuelled discussion in astrobiology circles.

The idea that life on Earth may have extraterrestrial origins is not new. Francis Crick and Leslie Orgel (1973), both pioneers of molecular biology, proposed "directed panspermia" — the concept that microorganisms or genetic material could have been intentionally sent to Earth by an advanced civilization. Crick himself, while cautious, noted that the DNA molecule's complexity seemed too extraordinary to have arisen purely through random chemistry in a short geological timeframe. Though mainstream science interprets panspermia in non-intentional terms (via meteorites or comets), Crick's proposal introduced the radical notion that intelligence might precede biological evolution.

In 2013, a controversial interpretation of a paper in Astrobiology sparked renewed interest. Some researchers (though later clarified to be misrepresented by media) examined whether certain anomalies in the human genome could reflect artificial modification. The paper itself dealt with panspermia as a mechanism of life distribution, but its popular reinterpretation — suggesting that Homo sapiens might have been "genetically engineered" — rekindled debate between evolutionary orthodoxy and directed creation (Sharov & Gordon, 2013).

If humanity was indeed influenced — or accelerated — by external intervention, what evidence would remain? Archaeologists and geneticists look to abrupt leaps in human development: the sudden expansion of the neocortex, the unexplained emergence of

language, and the so-called "Great Leap Forward" around 40,000 BCE when art, music, and complex tools appeared almost simultaneously (Mithen, 1996). Evolution can explain gradual adaptation, but cultural and cognitive revolutions often seem instantaneous. Could these "quantum jumps" represent not random mutations but deliberate enhancements - or cultural transmissions from a vanished progenitor civilization?

While mainstream academia remains firmly Darwinian, a small but persistent body of interdisciplinary research — ranging from comparative mythology to neurogenetics — continues to explore whether humanity's origin story might include intervention, guidance, or a forgotten hybridization event.

2. Why Only Humans Build Tools to Change the World?

When one observes a chimpanzee using a twig to extract termites or an otter cracking a clam with a stone, the continuity of tool use across species becomes evident. Yet humans differ in a critical way — we do not merely use tools; we reinvent them. The evolutionary chasm between crafting a stone flake and designing a quantum computer cannot be bridged by incremental improvement alone. It reflects a qualitative leap in cognition, abstraction, and foresight.

Cognitive neuroscience shows that human brains operate with remarkable efficiency. At any given moment, only 3–5% of neural activity is devoted to conscious processing; the rest functions subconsciously, handling pattern recognition, emotion, and motor control (Baars, 1997). This minimal conscious bandwidth forces the human mind to compress reality into symbols, models, and anticipations — the very roots of imagination. Unlike other animals, humans can simulate future scenarios, imagine alternate worlds, and create hypothetical problems to solve. Cognitive scientists describe this as "counterfactual thinking" — the mental ability to reason about events that have not yet occurred (Byrne, 2005). It is this faculty that enables invention, art, and science.

The philosopher Karl Popper once noted that "the human animal differs from the ape not by what it does, but by what it believes it can do." The evolution of this belief — the instinct to improve, innovate, and transcend — remains mysterious. Some anthropologists propose that a mutation in the FOXP2 gene roughly 100,000 years ago, associated with speech and complex syntax, may have catalysed symbolic thinking (Enard et al., 2002). Others see it as the emergent property of social cooperation. Yet there is a third possibility — that the human mind's peculiar creativity reflects programming by an unknown intelligence, one that embedded within us the drive to "fix the future."

In evolutionary terms, problem-solving offers survival advantage. A primate that anticipates seasonal scarcity or social threat has a better chance of enduring. However, humans extend this instinct far beyond necessity — we imagine problems that do not yet exist. From climate engineering to artificial intelligence, our species is perpetually rehearsing the future. Cognitive theorist Merlin Donald (1991) described this as the "theoretical culture" — a mode of thought that transcends direct experience. It suggests

that humans are not simply adapting to environments; we are adapting environments to our minds.

In a purely Darwinian framework, such foresight is the apex of natural evolution. Yet in an alternative interpretation — one entertained by thinkers such as Erich von Däniken (1968) and later by Zecharia Sitchin (1976) — this faculty might represent intentional design. If an external intelligence once "uplifted" proto-humans, perhaps the creative instinct was the intended outcome: the seed of civilization itself. Whether genetic mutation or divine spark, humanity's obsession with reimagining the world remains its defining mystery.

3. Messengers From the Stars — Ancient Records of Unknown Beings Long before telescopes and DNA sequencing, ancient peoples looked to the heavens and saw their origins there. Across continents, early civilizations recorded encounters with gods who "descended from the sky," taught agriculture, astronomy, writing, and kingship, and then departed — promising to return. These narratives, found in the cuneiform tablets of Sumer, the hieroglyphs of Egypt, the Vedas of India, and the codices of Mesoamerica, have striking parallels that defy geographic isolation.

In Sumerian mythology, the oldest known written civilization (c. 3500 BCE), the Anunnaki were described as powerful beings from the heavens who created or modified humanity to serve them (Sitchin, 1976). The Enuma Elish and Epic of Gilgamesh portray gods descending in fiery chariots, performing genetic or alchemical manipulations on "the clay of the earth." To mainstream Assyriologists (an expert who studies the history, archaeology, culture, and languages of ancient Assyria and Mesopotamia), these texts are mythopoetic allegories reflecting agricultural and cosmic cycles. Yet their technological imagery — including references to "black-winged ships" and "divine measures" — continues to intrigue alternative historians.

Egyptian hieroglyphs also depict gods like Thoth and Osiris descending from the stars to teach sacred geometry, writing (medu neter), and moral law. Some reliefs in the Temple of Dendera, often cited by fringe theorists, appear to resemble electric lamps, while others show what modern observers interpret as "flying disks." Though Egyptologists emphasize symbolic interpretation, the consistency of skyward motifs across millennia remains notable (Hancock, 1995).

Similarly, the Mayan Popol Vuh recounts gods who "came from above" and "formed man from maize," a curious parallel to the Sumerian tale of human creation from clay. The Mayan codices also contain star maps, particularly of the Pleiades and Orion — constellations deeply associated with rebirth in Egyptian cosmology. Such parallels suggest either universal archetypes of creation or remnants of a once-global mythic system.

Perhaps the most technically audacious ancient text is India's Vaimanika Shastra, a Sanskrit treatise allegedly describing aerial vehicles (vimanas) powered by mercury engines (Josyer, 1973). Though modern scholars date the text to the early 20th century and

dismiss its technological claims, the idea of flying craft appears in far older Vedic literature, including the Mahabharata, where gods and heroes engage in “sky battles” with celestial weapons that resemble modern missiles. Whether allegory or distorted memory, these descriptions imply that ancient peoples either imagined or witnessed technologies beyond their era’s capacity.

From Sumer to Mesoamerica, a shared pattern emerges: human civilization is portrayed as a gift from “those who came from the sky.” If these stories were purely symbolic, their uniformity across isolated cultures remains remarkable. If they are memories — however mythologized — of real encounters, then the question of humanity’s hybrid origin takes on startling depth. The line between divine myth and historical record becomes blurred, hinting that the ancient world’s gods may have been advanced beings whose presence jump-started human civilization.

4. Why Do Humans Pray to the Sky? Architecture as Evidence

Human architecture often embodies humanity’s longing for the heavens. From the stepped ziggurats of Sumer to the soaring spires of Gothic cathedrals, sacred structures reach upward, symbolically bridging earth and sky. But why is this orientation so universal? Why do nearly all ancient and medieval religious monuments point vertically, as if transmitting or receiving unseen energies?

In Hindu temple architecture, the towering Shikhara represents Mount Meru — the cosmic axis connecting human and divine realms. Similarly, the minarets of Islamic mosques rise skyward, guiding the call to prayer. Christian churches, particularly in the Gothic era, elongated their spires into needle-like forms designed to draw the eye heavenward and, perhaps subconsciously, to emulate ascent. This architectural convergence could be purely symbolic. Yet some researchers propose a more technological interpretation: that these structures mimic the design principles of energy transmitters or resonant antennas (Dunn, 1998).

Engineer Christopher Dunn’s The Giza Power Plant (1998) advanced the controversial hypothesis that the Great Pyramid of Giza was not a tomb, but a machine designed to resonate with Earth’s electromagnetic field. He argued that its internal geometry — with granite chambers aligned along precise harmonic ratios — suggests acoustic and electrical functionality. Nikola Tesla, a century earlier, had proposed that energy could be transmitted wirelessly through Earth’s resonance, and he reportedly studied pyramid geometry while designing his Wardenclyffe Tower (Tesla, 1905). Both Tesla’s and Dunn’s ideas remain speculative but invite re-examination of ancient engineering achievements not as primitive attempts at monument building but as potential remnants of lost scientific understanding.

Modern research has revived curiosity about the physical properties of pyramids. In 2020, Russian and Ukrainian physicists conducted controlled experiments on pyramid-shaped structures and reported measurable electromagnetic anomalies within their chambers

(Ivanov et al., 2020). These included increased ionization levels and unique resonance effects at specific frequencies. While these findings do not confirm energy generation or transmission, they demonstrate that pyramid geometry interacts with electromagnetic fields in nontrivial ways. Ancient builders may have discovered such phenomena empirically, encoding them into sacred architecture.

The symbolism of "upward prayer" may thus carry dual meaning — spiritual aspiration and technological remembrance. To early humans, the sky was both the realm of gods and the source of light, rain, and celestial order. The act of building upward could represent not only devotion but communication, an attempt to reconnect with "sky beings" who once descended. The architectural continuity — pyramids, spires, stupas, ziggurats — across millennia and continents hints at a universal impulse, perhaps inherited from a time when humans believed, or knew, that the heavens once touched the earth.

5. Sacred Geometry and Universal Alphabets

From the earliest inscriptions on stone to the codified alphabets of antiquity, humanity's written symbols share uncanny similarities. Across cultures separated by oceans and millennia — Egypt, the Indus Valley, Phoenicia, and Mesoamerica — one finds recurring geometric motifs: triangles, spirals, V-shapes, and intersecting lines that form proto-letters. Scholars of comparative linguistics and semiotics have long noted these patterns, but explanations diverge between evolutionary convergence and diffusion from a single source civilization.

In ancient Egypt, the hieroglyph for the ox head — aleph — was drawn as a triangular or A shaped symbol. This same form, inverted or stylized, appears in Phoenician script as aleph, in Greek as Alpha, and in Latin as A. Similarly, in the Indus Valley script, V-shaped markings occur frequently on seals, often associated with depictions of fertility or divine energy (Parpola, 1994). In Mesoamerica, early Zapotec and Mayan glyphs also include V-shaped patterns denoting origin, opening, or speech. How did cultures with no direct contact converge upon the same shapes to signify beginnings, power, or divinity?

One explanation lies in human neurology. Carl Jung's theory of the collective unconscious (1959) proposed that archetypal patterns — recurring symbols and myths — are imprinted in the human psyche through shared evolutionary experience. From this psychological perspective, geometric archetypes like triangles, spirals, and crosses represent innate cognitive blueprints. Modern neuroscience supports this to some extent: the human visual cortex is wired to detect geometric primitives (edges, lines, junctions), making certain shapes universally salient (Livingstone & Hubel, 1988). Thus, "A-shaped" symbols could arise independently as natural extensions of how the brain processes symmetry and stability.

However, Jung's archetypes might also preserve more than biological predisposition. They could be cultural fossils — fragments of a once-unified symbolic language passed down from a progenitor civilization. The "archetypal diffusion" theory, though controversial,

suggests that humanity's earliest scripts share a common origin in a prehistoric high culture predating the last Ice Age (Hancock, 2015). Such a civilization, if it existed, may have encoded its knowledge in geometric symbols simple enough to survive catastrophe and migration.

Sacred geometry provides another dimension to this hypothesis. The triangle, circle, and spiral are not merely aesthetic forms; they encode mathematical constants — π (pi), φ (phi), and the Fibonacci sequence — found in natural structures from galaxies to DNA helices. Ancient builders seemed aware of these proportions long before formal mathematics existed. The Great Pyramid's height-to-base ratio approximates 2π, while Indian mandalas and Gothic rose windows mirror the geometry of the golden ratio. Were these coincidences of intuition, or inheritances of a shared mathematical tradition?

The Om (Aum) symbol of Hinduism epitomizes this intersection of sound, geometry, and cosmology. Its three curves, semicircle, and dot represent waking, dreaming, and transcendental states of consciousness — yet graphically, it mirrors the Greek Alpha and the Egyptian ox head. If one traces their evolution, a continuous lineage of form and meaning emerges: creation, initiation, and the beginning of sound — the Word. Whether this convergence arose independently or through transmission, it reveals a profound unity underlying human semiotics. It suggests that long before languages diversified, there existed a universal "alphabet of being" through which humans sought to communicate with the cosmos.

6. Global Memory Reset — Survival of Civilization After the Last Ice Age

Around 12,800 years ago, at the end of the Pleistocene epoch, Earth experienced one of its most abrupt and devastating climate shifts — the Younger Dryas Impact Event. Geological evidence points to a massive influx of extraterrestrial material, possibly from a fragmented comet, which triggered sudden global cooling, widespread wildfires, and megafaunal extinctions (Firestone et al., 2007). Sea levels rose dramatically, submerging coastal plains and forcing surviving human populations to migrate inland. This catastrophe effectively erased much of the prehistoric world, leaving only fragmented myths of deluge and divine wrath.

What followed was a global cultural amnesia — and the scattered rebirth of civilization. Archaeological anomalies such as Göbekli Tepe in modern-day Turkey, dating to circa 9600 BCE, demonstrate that advanced architecture and astronomical alignment emerged almost immediately after the cataclysm (Schmidt, 2010). The builders of Göbekli Tepe, hunter gatherers with no known antecedent civilization, erected massive stone pillars carved with intricate animal reliefs. Some researchers suggest that these symbols encode constellations, possibly memorializing the cosmic disaster itself (Schoch, 2013). If true, Göbekli Tepe stands not as the beginning of civilization, but as its reconstruction — evidence that survivors of a lost world carried forward fragments of knowledge.

Flood myths from every continent echo this shared trauma. In Mesopotamia, the Epic of Gilgamesh recounts Utnapishtim's survival of a divine deluge; in India, the Satapatha Brahmana tells of Manu rescued by a celestial fish(Matsya Avataar); the Hebrew Book of Genesis describes Noah's Ark preserving humanity; and the Aztecs spoke of the Sun Flood that ended the previous world. These stories differ in detail but share an archetypal structure: divine warning, destruction by water, preservation of chosen survivors, and renewal of civilization. Anthropologists once dismissed such parallels as psychological metaphors. Yet geological and ice-core data now confirm that a sudden, planet-wide flood event indeed occurred around the same time these myths purport to describe (Kennett et al., 2015).

The possibility arises that advanced prehistoric societies — perhaps maritime cultures situated along the now-submerged continental shelves — were obliterated during this period, their survivors becoming the progenitors of later civilizations. Graham Hancock (2015) and Randall Carlson (2014) argue that this "global reset" could explain why agriculture, monumental architecture, and astronomical knowledge appear abruptly around 10,000 BCE in multiple regions: Mesopotamia, Egypt, the Indus Valley, and Mesoamerica. If remnants of a pre-Ice Age civilization transmitted their wisdom to post-cataclysmic peoples, they would appear to later generations as gods descending from the heavens. Some traditions preserve this notion explicitly. The Egyptian god Thoth was said to have "brought back the lost words of the First Time"; the Andean Viracocha re-taught humanity agriculture and writing after the flood; the Sumerian Oannes emerged from the sea to civilize the nomads. These are not isolated motifs but shared memories of cultural restoration. Whether interpreted symbolically or historically, they suggest that civilization's rise may have been less an invention than a recovery — a reawakening of dormant knowledge encoded in myth.

If the Younger Dryas event nearly extinguished humanity, then our modern species carries the legacy of survival — and perhaps the guilt of forgetfulness. The myths of flood and rebirth may not only describe environmental cataclysm but the psychological trauma of losing connection to a once-greater understanding of nature and cosmos. The stone temples, megaliths, and celestial alignments built afterward may have been attempts to preserve or reestablish that lost communion.

7. Rational Speculation — Evolution or Intervention?

Having traversed the scientific, mythological, and architectural threads of human origin, the question remains: are we the products of random evolution, survivors of cyclical cataclysm, or beneficiaries of intelligent design? To synthesize these perspectives, one can envision three overlapping models — not mutually exclusive, but interwoven like the triple helix of myth, memory, and mutation.

Model I: Pure Evolutionary Progression

This model aligns with mainstream biology. It views humanity as the inevitable outcome

of evolutionary pressures acting upon hominins for millions of years. From bipedal locomotion to tool use and language, each adaptation compounded to produce intelligence capable of abstract reasoning. The Great Leap Forward, in this view, reflects the threshold at which cultural evolution outpaced biological evolution. Random mutation, sexual selection, and environmental challenge together sculpted a species capable of transcending instinct (Tattersall, 2012). Within this paradigm, myths of divine intervention are psychological projections of humanity's newfound self-awareness — our tendency to externalize creativity as gods.

Model II: Cataclysm + Cultural Memory

This model accepts evolutionary biology but posits that civilization's apparent discontinuities — sudden technological and cultural leaps — result from cyclical destruction and rediscovery. Catastrophism, once derided in favour of gradualism, is now recognized in geology as a legitimate process. Mass extinctions punctuate evolutionary history, and human culture may follow the same rhythm. Each cataclysm — whether natural or self-inflicted — resets the collective memory, leaving survivors to rebuild using vestiges of lost knowledge. This model elegantly explains flood myths, global architectural parallels, and abrupt cultural awakenings. It portrays humanity as both resilient and forgetful, caught in an eternal cycle of ascent, collapse, and rebirth.

Model III: Guided Evolution / Hybridization

The third model ventures into the frontier of speculation but resonates deeply with ancient narratives. It suggests that external intelligences — whether extraterrestrial, interdimensional, or remnants of a prior terrestrial species — may have influenced human development. This influence could have been biological (genetic modification or hybridization), cultural (direct instruction), or energetic (catalysing consciousness through unknown means). The Anunnaki legends, Vedic vimanas, and celestial teachers from Egypt to the Andes fit this template. In modern terms, this hypothesis parallels the "Zoo Hypothesis" in astrobiology, which posits that advanced civilizations might observe or subtly guide developing species without overt interference (Ball, 1973).

Critics argue that invoking intervention undermines scientific parsimony. Yet, as physicist Michio Kaku (2011) notes, the universe is vast enough that the absence of evidence cannot be equated with evidence of absence. Moreover, if intelligence exists elsewhere, the possibility that it has influenced Earth cannot be ruled out a priori. Whether the agents of this influence were ancient astronauts, noncorporeal entities, or an advanced pre-human species, their legacy may persist in our DNA, myths, and monuments.

Why Mainstream Science Resists Alternative Narratives

Modern science, grounded in empirical validation, rightly demands falsifiable evidence. Myths, linguistic parallels, and architectural coincidences do not meet the threshold of proof. Yet scientific orthodoxy can itself become dogmatic when it excludes inquiry that challenges established paradigms. Thomas Kuhn (1962) described this as the inertia of "normal science" — the resistance to paradigm shifts until anomalies become undeniable.

‘হাঁড়িয়া’

লক্ষীকান্ত টুডু
অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, **সাঁওতালি বিভাগ**

‘হাঁড়িয়া’ শব্দটি সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি ‘হাঁড়ি’ থেকে এসেছে। হাঁড়ি হল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ভাত ভিত্তিক অ্যালকোহল যুক্ত বিশেষ পানীয়; যা ভাত থেকে তৈরী বিয়ার জাতীয় পানীয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যের বসবাসকারী সাঁওতালদের কাছে হাঁড়ি খুব জনপ্রিয়। এছাড়া ভারতের বাইরে নেপাল, বাংলাদেশেও এই ‘হাঁড়ি’ খুব প্রচলন। এই হাঁড়ি তৈরী করা হয় ‘ভাত’ ও ‘বাখরবড়ি’ দিয়ে। ‘রানু’ অর্থাৎ ‘বাখরবড়ি’ বন জঙ্গলের নানান প্রকার ভেষজ উদ্ভিদের মূল সংগ্রহ করা হয়। ওই মূলকে পেশাই করে গোল গোল আকৃতির ছোট ছোট বড়ি তৈরী করে রাখা হয়। এই বড়ির নাম ‘রানু’। ওই ‘বাখরবড়ি’ গুঁড়ো করে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে ‘হাঁড়িয়া’ তৈরী করা হয়। পূর্বে চোরকাটা আতপ চালের ভাত তাতে বাখর মিশিয়ে হাঁড়িয়া রাখা হতো।

সাঁওতাল সমাজে ‘হাঁড়িয়া’ উৎপত্তির ইতিহাস তাদের পৌরানিক কাহিনীর সাথে জড়িয়ে রয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী ‘হাঁড়িয়া’ তৈরী করা শিখিয়েছিলেন সাঁওতালদের দেবতা ‘লিটৌ গঁশায়’। যাকে সাঁওতাল সমাজের সর্বোচ্চ দেবতা ‘মারাং বুরু’ নামে জানা যায়। লিটৌ গাঁশায় পিলচু হাড়াম পিলচু বুটিকে প্রথম ‘হাঁড়িয়া’ তৈরী করা শিখিয়েছিলেন। পিলচু হাড়াম পিলচু বুটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রথম মানব মানবী। লিটৌ চিন্তা করলেন এই দুই মানব-মানবীকে বিয়ে না দিলে পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই লিটৌ দুই মানব মানবী অর্থাৎ পিলচু হাড়াম পিলচু বুটিকে ‘টাঁটি ঝারি’ জঙ্গলে নিয়ে গেল। ওখানে কিছু ঔষধ গাছের শিকড় খুঁজে পাওয়ার জন্য। লিটৌ দেখলেন, ‘টাঁটি ঝারি’, ঝরনার জলে একাধিক ঔষধের শিকড় ডুবে আছে। ঐই শিকড় দুই মানব কে নিয়ে আসতে বলল। ঔষধ গাছের শিকড় দিয়ে ‘বাখর’ বানিয়ে হাঁড়িয়া রাখার নির্দেশ দেন লিটৌ গঁশায়। পিলচু হাড়াম পিলচু বুটি ‘ডকা’ গাছের ‘উখুড়’ বানালো। সেই উখুড়ে ঔষধ গাছের শিকড় গুঁড়ো করে বাখর্ বড়ি বানালো এবং চোর কাটার চাল দিয়ে ভাত তৈরী করলো। ওই ভাতকে শুকিয়ে তাতে বাখর বড়ি গুঁড়ো করে একসঙ্গে মিশিয়ে ‘লাড় খালাঃ’এ হাড়িয়া রাখল। হাঁড়িয়া তিন থেকে পাঁচ দিনের মাথায় পুরোপুরি তৈরী হলো। তৈরী হওয়া ওই হাঁড়িয়া লিটৌর মতে পাঁচটা শাল পাতার ফুডুঃ (বাটি) তৈরী করল। সেই ফুডুঃ-এ হাঁড়িয়ার ঝারদাঃ আর জল রাখা হলো। লিটৌ তখন আদেশ দেয় ফুডুঃ এ রাখা ঝার হাঁড়ি আর জল দিয়ে প্রথমে মারাংবুরু দেবতার স্মরণে চডর করে উৎসর্গ করা। তারপর পিলচু হাড়াম পিলচু বুটি নাম নিয়ে চডর (উৎসর্গ) করা। সেই আদেশ মেনেই মন্ত্র পাঠ করে দেব দেবীর প্রতি ঝার হাঁড়িয়া উৎসর্গ করে।

হাঁড়িয়া উৎসর্গ করার পর লিটৌ গঁশায় দুই মানব মানবীকে হাঁড়িয়া পান করার নির্দেশ দেয়। পরে সে ওখান থেকে চলে যায়। তারা ওই হাঁড়িয়া পান করে এবং দুইজনে নেশায় মুগ্ধ হয়। সেই নেশা অবস্থাতে দুজনের মিলন হয়। পরের দিন লিটৌ গঁশায় তাদের কাছে আসতে তারা লজ্জায় মুখ লুকাতে থাকে এবং তাদের কর্মের দোষ স্বীকার করে। তখন লিটৌ গঁশায় তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং দুজনের বিয়ে দেয়। তাদের বলে তোমরা আজ থেকে দুই মানব-মানবী স্বামী-স্ত্রী। তোমাদের দুজনের মিলন না হলে এই পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি হবে না। পরে পিলচু হাড়াম পিলচু বুটি থেকে বংশবৃদ্ধি হয়। ওই বংশধরকে হড় অর্থাৎ মানুষ নামে জানা যায়। পরবর্তীতে এদের খেরোওয়াল, সানতাড়, সাঁওতাল ইত্যাদি নামে জানা যায়।

সাঁওতালদের পুরান প্রথা অনুযায়ী দেবতাদের প্রতি উৎসর্গ করার জন্য হাঁড়িয়া সৃষ্টি হয়েছিল। হাঁড়িয়া কথায় কিভাবে ব্যবহার হবে তার স্থানও চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন লিটৌ গঁশায়। সাঁওতাল সমাজে সব থেকে বড় সংস্কৃতি হল জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে মারাংবুরুকে পুজো দেওয়া হয়। পুজো দেওয়ার সময় শাল পাতার (ফুড়ুঃ) বাটি করে হাঁড়িয়া চডর (উৎসর্গ) করা হয়। এছাড়া মাঘ, বাহা, সহরায় ইত্যাদি পূজা এবং পার্বণে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়।

বর্তমানে সাঁওতাল সমাজের কিছু মানুষ লিটৌ গঁশায় দেবতার তৈরী পবিত্র হাঁড়িয়াকে পানীয় হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে এই পানীয় পান করে চলেছে। অতিরিক্ত পান করার ফলে স্বাস্থ্য সমস্যা এবং পারিবারিক অশান্তির পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। হাঁড়িয়া দেবতাদের উৎসর্গ করার প্রতীক মাত্র। তাই হাঁড়িয়া তৈরী করা, পান করা এবং ব্যবহারে সচেতনতা খুব জরুরী। কারণ হাঁড়িয়া সাঁওতাল সমাজের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রানু অর্থাৎ বাখর বড়ি

শালপাতার ফুড়ুঃ (বাটি) সঙ্গে হাঁড়িয়া

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মশা’; কল্পনা বিজ্ঞান ভাবনা এবং…

অরিজিৎ মান্না
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের মহাবৃক্ষের সর্ব শাখায় সমানভাবে যে ক'জন সাহিত্যিক নিজস্ব অবদান রেখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্যতম। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম। শৈশবেই পিতা ও মাতাকে হারান, বড় হয়েছেন দাদামশাই ও দিদিমার ছত্রছায়ায়। দাদামশাই রাধারমন মিত্র ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শৈশবের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে। রাধারমনের মৃত্যুর পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে দিদিমা কুসুমকুমারী চলে আসেন নলহাটিতে, সেখানে কিছুদিন থাকার পরে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতার সাউথ সাবারবান স্কুল থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে তিনি ‘ঊর্ধ্বে শুভ্র হিমালয়’ নামের প্রথম কবিতা লেখেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেও চলে আসেন সাউথ সাবারবান কলেজে (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ)। আজীবন তিনি ছিলেন অস্থির প্রকৃতির মানুষ, তাই আশুতোষ কলেজেও পাঠ সমাপ্ত না করে চলে যান শান্তিনিকেতনে কৃষিবিদ্যা শিখতে, কিন্তু সেখানেও তিনি স্থিত হতে পারলেন না, শান্তিনিকেতন ছেড়ে কৃষিবিদ্যা সমাপ্ত রেখে নিজের অন্তরের সুপ্ত পিপাসা মেটাতে ডাক্তার হওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু ডাক্তার হওয়া আর হলো না। ডাক্তার না হয়ে ঘটনাচক্রে তিনি হলেন সাহিত্যিক। গোবিন্দ হোসেন লেনের একটি মেসে এক কেরানিকে লেখা একটি চিঠি কুড়িয়ে পাওয়ার পর লেখেন ‘শুধু কেরানী’। এটিই প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম গল্প যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ছাপা হয়। ‘কল্লোল’-এ এই গল্পের প্রশংসা সূচক সমালোচনা বের হওয়ার পর তিনি ডাক্তার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হয়ে যান। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কিশোরসাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ বিবিধ ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে লিখে চললেন। সাহিত্য রচনা ছাড়াৎ শিক্ষকতা, ওষুধ কোম্পানির প্রচার বিভাগের কাজ, পত্রিকা সম্পাদনা, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা, আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার মতো নানা সৃজনশীল কাজে যুক্ত থেকেছেন। পেয়েছেন পদ্মশ্রী, রবীন্দ্র ও অকাদেমি পুরস্কার, দেশিকোত্তম।

ছোটো গল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশি। তিনি ৩০টি ছোটোগল্প সংকলন এবং ৩০টি কিশোরদের উপযোগী গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গল্পগুলিকে নিবিড়ভাবে পড়লে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির গল্প ঃ এই শ্রেণিতে রয়েছে শুধু কেরানী, গোপণ-চারিণী, সংক্রান্তি, পুন্নাম, শৃঙ্খল ইত্যাদি।

২। মনস্তত্ত্ব প্রধান গল্প ঃ হারানো মেয়ে, মোটবারো, হয়তো, চুরি, সাগর সঙ্গম, মহানগর, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, সংসার সীমান্তে ইত্যাদি।

৩। বিজ্ঞানভিত্তিক ও গোয়েন্দা গল্প ঃ ঘনাদার গল্পগুলি এবং পরাশর বর্মার গল্পগুলি।

আমরা এই নিবন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঘনাদার ‘মশা’ গল্পটি নিয়েই আলোচনা করব। খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো এই গল্পের ভিত্তিভূমি, তা শুধুই কি কল্পনা নাকি এর মধ্যে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সচেতন অনুসরণ।

১

প্রেমেন্দ্র মিত্র বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, ছোটোবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল। ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়। সেই বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। 'গোটা মানুষ'-এর মানে খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন মানুষের জীবন যন্ত্রণা, হতাশা, নৈরাশ্যকে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য তিনি সমসাময়িক যুদ্ধোত্তর সমাজকে দায়ী করেছেন। আর এই সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য মানুষকে হতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক, উন্নত বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বাংলা 'গল্প বিচিত্রা'য় বলেছেন "যে কালভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশ, তাঁর কবি মানস ও জীবন প্রতিতীর অনিশ্চয়তা সেই ভূমিরই শস্য। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী বিকৃত ও ক্ষোভে জর্জরিত, জ্বালায় তার অন্ত নেই এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি তার স্বতঃই কাম্য; কিন্তু সেই বাঞ্ছিত মুক্তি কোনো পথ দিয়ে আবির্ভূত হবে তার সন্ধান সে তখনো পায়নি। .... তাই তার মধ্যে একাধারে সংগ্রামী ও পলাতক বিজ্ঞান মানস এবং আদিমত সংসক্তি;[১] তিনি বুঝেছিলেন শিশু কিশোর মনকে বিজ্ঞান ও যুক্তি নিষ্ঠ করে গড়ে তুললেই ভবিষ্যতে সেই বিদ্রোহ পরিণতি লাভ করবে। সেই কারণেই তিনি শিশুদের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখতে শিরু করলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ক্ষতিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদিত ছোটদের 'রামধনু' পত্রিকায় ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম শিশু সাহিত্য 'সেকেলের কথা' পরবর্তীকালে এটিই 'পিঁপড়ে পুরাণ' নাম নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন, "শিশু সাহিত্যে এই শক্তিশালী লেখ এর আবির্ভাব দেখে তখনকার অন্যান্য ছোটদের মাসিক পত্রের সম্পাদকরা ও প্রেমেন্দ্র বাবুকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলেন। প্রেমেন্দ্র বাবু কাউকেই বিমুখ করলেন না। তাঁর লেখা নিয়মিত বেরুতে লাগলম মৌচাকে, রং মশালে আরো নতুন নতুন কাগজে। পূজাবার্ষিকীগুলোতে। ... শিশুসাহিত্যে যেন সাড়া পড়ে গেল।"[২] এরকমই একটি শিশু কিশোর পাঠ্য পত্রিকা 'দেব সাহিত্য কুটির' থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার পূজাবার্ষিকী প্রথ সংখ্যায় ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মশা' নামে একটি কল্প বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, যার প্রধান চরিত্র ঘনাদা ওরফে ঘনশ্যাম দাশ।

'মশা' গল্পের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত ঘনাদা বাংলা সাহিত্যে এক অদ্ভুত চরিত্র, তার গল্প বলার ক্ষমতা, রহস্য অভিযান ও বিজ্ঞান নির্ভর কাল্পনিক কর্মকাণ্ডগুলি বাংলা শিশু কিশোর মনে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। এই ঘনাদাকে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকগুলি গল্প গ্রন্থ রচনা করেছেন যা ঘনাদা সিরিজের গল্প নামে খ্যাত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুল পড়াশোনার মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান থেকে তথ্য আহরণ করে, তার সঙ্গে কল্পনা ও বাঙ্গালীর আড্ডা প্রিয়তা মিশিয়ে এই গল্পগুলি রচনা করেছেন। এর প্রধান আকর্ষণ বিন্দুতে রয়েছে ঘনাদা, তিনি সবার প্রিয় দাদা, তার বয়স কত হতে পারে তা আন্দাজ করা ভীষণ শক্ত। প্রথম গল্প 'মশা' তে যেহেতু ঘনাদার আবির্ভাব তাই সেখানে লেখক ঘনাদার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড় বের করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারেই অসম্ভব পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোনো বয়সেই তার হতে পারে।"

আর ঘনাদার জ্ঞানের পরিধি আমারা তার গল্প থেকে আন্দাজ করতে পারি তিনি কখনও সিপাহী বিদ্রোহের সময় চলে যেতে পারেন, আবার অন্য গল্পে রুশ-জাপান প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের কথাও নিখুঁত বর্ণনা করতে পারেন। সেই গল্পের ঘনাদা সারা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়ালেও বাস্তবে তিনি একজন বাক্য বীর বাঙালি, যিনি শিশির-শিবু-গৌরের মতই একটি মেসের বাসিন্দা। প্রথম গল্পের সেই মেসের ঠিকানা উল্লেখ না থাকলেও 'টুপি' গল্পে আমরা জানতে পারি তিনি ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের একটি মেসে থাকেন। ঘনাদা আড্ডাবাজ কিছুটা

ভোজনরসিক ও অভিমানী ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি যে গল্পগুলি বলেন তাতে বিজ্ঞানের ভূগোলের এবং ইতিহাসের মধ্যে তত্ত্বগত কোনো ত্রুটি থাকে না। এই ঘনাদা আসলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অথচ রোমান্টিক ও ফ্যান্টাসিক কল্পনা মিশ্রিত প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই আর এক সত্ত্বা। তিনি ছিলেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানকে নির্ভুল তথ্য সহযোগে কিশোরদের মনে র রুদ্ধ দ্বার উন্মোচিত করতে। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, "বিজ্ঞানের অক্লান্ত সন্ধান নিত্য যে নতুন জগৎ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে তুলছে তার বিস্ময় বিহ্বলতা পাঠক মনে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এই কাহিনীর আসল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে আতঙ্কের শিহরণ সে যেমন তুলতে পারে, তেমন দিতে পারে কৌতুকের স্বাদও।"[৩]

কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী (science fiction) পরিভাষাটি ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম ব্যাবাহার করেন 'Amazing stories' এর সম্পাদক ইউগো গার্নব্যাক এবং জন ডব্লিউ ক্যাম্পব্যান। তবে প্রকৃত সায়েন্স ফকিশনের জনক বলা হয় জুলভার্নকে। তাঁর 'Five weeks in a balloon' (1863) এই লেখাটিই প্রথম কল্পবিজ্ঞানমূলক রচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সায়েন্স ফিকশন বলতে বোঝাতো - "... Fantastic fiction based on extrapolate or imaginary science."[৪] কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই লেখা সংরূপ ও উদ্দেশ্য বদলাতে থাকলে বলে যায় এর সংজ্ঞাও –"science fiction, is a genre of speculative fiction that typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universes, and extraterrestrial life. It has been called the 'literature of ideas', and it often explodes the the potential consequences of scientific social and technological innovations." অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞান কেবল লঘুচালের খেয়ালী কল্পনা জাতীয় রচনা নয়। এখানে বিজ্ঞানের বাস্তবতার ওপর ভর করেই, লেখকের দূরদর্শী কল্পনায় জেগে ওঠে অনাগত ভবিষ্যতের রোমাঞ্চ ও বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান লেখেন জগদীশচন্দ্র বসু - 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর সুকুমার রায় জগদানন্দ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের হাত ধরে বাংলা কল্পবিজ্ঞান দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চলেছে। এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদা সিরিজের লেখা কল্পবিজ্ঞানগুলি একটু আলাদা ধরণের। কারণ এই গল্পগুলি তিনি খুবই হালকা চালে লেখা শুরু করলেও, তথ্যগত এবং বিজ্ঞানের সত্যগত কোনো ত্রুটি আমরা খুঁজে পাই না। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি দেখে, অথচ গল্পের বাচনভঙ্গি ও ধরণে তিনি একেবারেই সরল মসেবাড়ির আড্ডা বা বৈঠকি চালে গল্পগুলি আপাত অবিশ্বাস্য হলেও অদ্ভুত রোমাঞ্চ রসের গুণে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সত্যতা যে নিরুপনভাবে রক্ষিত হয় তা যে নিছক কবি কল্পনা নয় তা সিরিজের যে কোনো গল্প বিশ্লেষণ করলেই বোঝ যায়। আমরা তার এই সিরিজের প্রথম গল্প 'মশা' গল্পটি নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি।

২

'মশা' গল্পটির প্রথমে রয়েছে ঘনাদার চেহারার বর্ণনা, তারপর পাওয়া যায় ঘনাদার আড্ডায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা যেমন – দামোদরের বন্যার প্রসঙ্গ এলে ঘনাদা টাইডাল ওয়েভ এর প্রসঙ্গ আনেন, এই সামুদ্রিক ঢেউ-এ চেপে ঘনাদার তাহিতি দ্বীপ থেকে ফিজি দ্বীপে যাওয়াটা লেখকের কল্পনাপ্রসূত কিশোর মনের বিস্ময়ের জন্যই যে সৃষ্টি তা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কিন্তু এই তাহিতি ও ফিজি দ্বীপ যে বাস্তবে একই মহাসাগর (South Pacific Ocean)-এ প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করে এবং এই দ্বীপটি Black-Lip Pearl (*Pinctada margaritifera*) এই মুক্তার জন্য বিখ্যাত। ঘনাদা যখন বলেন মুক্তোর ব্যবসার জন্য তাহিতি

দ্বীপে গিয়ে উঠেছি তখন তা সত্যই বলেন। এছাড়া ঘনাদা যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি ‘কন্ডর’ শকুনের বাসার সন্ধানে অ্যান্ডিজ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন তাতেও তথ্যগত কোনো ত্রুটি নেই। কারণ এই শকুনই পৃথিবীর বৃহত্তম পাখি – "Condor is the common name of New World vultures in South America. They are the largest flying land birds in western hemisphere." কিন্তু বোরোরো জাতির বারো হাজার ফুট ওপর থেকে দেখা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির যে কথা ঘনাদা বলেছেন তা নিছকই ওই মেসের ছেলেদের মনে বিস্ময় জাগানোর জন্য। সাখালীন দ্বীপের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তার ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, এবং জলবায়ুর; কোথাও বিন্দুমাত্র কল্পনা বা মিথ্যার আশ্রয় নেই। এই সাখালীন দ্বীপ সম্পর্কে বর্তমানে এনসাইক্লোপিডিয়াতে আমরা যে তথ্য পাই তার সঙ্গে লেখকের বর্ণনা হুবহু মিলে যায় –
Sakhalin has a cold and humid climate, ranging from humid continental in the south to the centre and north... It ranges from around 500 mm on the Northwest coast to over 1,200 mm in southern mountainous regions... The maritime influence makes summers much cooler than in similar latitude inland cities, but makes the winters much snowier and a few degrees warmer than in interior East Asian cities at the same latitude. Summers are foggy with little sunshine."

এই ‘মশা’ গল্পে বিজ্ঞানকে যুক্তিনিষ্ঠ ও সরসভাবে দেখালেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। শৈশব থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর দাদামশাই প্রখ্যাত চিকিৎসক রাধারমন মিত্রের কাছে, তারপর বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন পড়তে, লক্ষ্য ছিল চিকিৎসক হওয়া। কিন্তু তা হয়নি হয়েছিলেন লেখক, সেই বিজ্ঞান পাঠের অভিজ্ঞতা, জীববিদ্যা প্রাণিবিদ্যার কথা আমরা তাঁর লেখা এই কল্পবিজ্ঞান মূলক লেখাগুলিতে খুঁজে পাই। যেমন এই ‘মশা’ গল্পে তিনি মশার রক্ত শোষণ ও জীবাণু প্রবেশের যে পদ্ধতি সম্পর্কে মি. মার্টিন ও ঘনাদাকে বলেন – ‘‘মশা কি করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারি যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের উপর বসে প্রথমেই একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুঁটো করে, তারপর আরেকটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়। আমাদের শরীরে যে রোগের জীবানু ঢুকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে।” এই বর্ণনায় মশার সূচক যন্ত্র (Probosics) সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা এইরকম –

‘গায়ের উপর বসে প্রথমে একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে’ - এই অংশের বৈজ্ঞানিক নাম - Mandibles-mandibles hold the tissues apart. Imagine eating a steak; one hand (mandible) in holding the fork while the other hand (maxillage) is using a knife to slice through the meat. এবং সেই চামড়াকে ফুটে করতে যে অংশ সাহায্য করে তার নাম - -Labrum-the labrum acts as a probe, searching for a blood-vessel beneath the skin. তারপর আরেকটি যন্ত্রে মুখের লালা লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে এরপর সে রক্ত শুষে নেয়।’ - এই অংশের সঙ্গে মিলে যায় মশার - -Hypopharynx the hypopharynx lays on the labrum to create a straw-like structure .The hypopharynx begins pumping saliva into the victim as soon as the fascicle pierces the skin to stave off our immune response, lubricate the proboscis,keep blood coagulating and dilate our blood vessels.[৭]

অর্থাৎ আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রেমেন্দ্র মিত্র তার কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্পে যে অংশে বিজ্ঞানের অবতারণা করেছেন, অথবা রাজনৈতিক, ভৌগোলিক যে বর্ণগুলি দিয়েছেন সেগুলি সবই সত্যনিষ্ঠ, যেখানে আজব কল্পনার কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার বলেছেন, - “তথ্যের শক্ত বনেদ

চাই। তার উপর প্রচন্ড কাল্পনিকতা, স্পর্শকাতর হৃদয় আর সুগভীর সরসতা। ভাগ্যক্রমে শেষের তিনটি গুণ নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্মেছিলেন।[৮]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প, বিশেষ করে কল্পবিজ্ঞান আশ্রিত ঘনাদার গল্পগুলিতে কল্পনা, রহস্য, উদ্ভট ভাবনা বিজ্ঞানের ভিত্তিসহ, বাক্যবীর বাঙালি চরিত্র ঘনাদার কথা যেমন রয়েছে, তেমনি এই গল্পগুলিতে তিনি মানব মনের বিভিন্ন দিকেও আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। সেই মানব চরিত্রের বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলিও হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সমালোচক তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'সাম্প্রতিক বিজ্ঞান রহস্য-এর প্রতি প্রেমেনদার আকর্ষণ যেমন সত্য, মানব মনের জটিলতা সন্ধানে তাঁর আগ্রহ তেমন স্বভাবজ।' মশা গল্পটিতে আমরা তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। গল্পটির বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ একটি সামান্য মশা, এই তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে একেবারে গুরুগম্ভীর বিষয় সমাজের অপরাধীদের শাস্তি পর্যন্ত এই গল্পে একই আসনে স্থান পেয়েছে। গল্পটি হালকা চালে শুরু হলেও তানলিন নামে চিনা কর্মচারীর মূল্যবান অ্যাম্বার সহ হারিয়ে যাওয়ার পরই গল্পের রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে। বিজ্ঞান ভূগোল এর তথ্য পরিবেশনের সাথে সাথে লেখক আমাদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের রসও ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এই মশা গল্পটিতে কল্পবিজ্ঞানের গল্প কথার সাথে সাথে কল্লোলীয় গল্পকার প্রেমেন্দ্র পূর্ণ মানুষের সন্ধান করেছেন। মানব চরিত্রে জটিলতা, আপাত সারল্যের মুখোশে লুকিয়ে থাকা, জ্ঞানের আড়ালে লুকিয়ে অসাধু চরিত্রদের চিহ্নিত করেছেন - নিশিমারা চরিত্রে মধ্যে দিয়ে। নিশিমারা বিজ্ঞানকে মানুষের ধ্বংস করার কাজে লাগাতে চেয়েছিল, এরা স্বার্থকেন্দ্রিক লোভী, সমাজ শত্রুর প্রতিনিধি। এই মশা গল্পের মধ্য দিয়েই ঘনাদার বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। ঘনাদা সত্যসন্ধানী, সাহসী। প্রেমেন্দ্র সৃষ্ট ঘনাদা কিন্তু বাঙালির মতো অলস নয়, তিনি যথেষ্ট কর্মক্ষম সাহসী তাই তিনি এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন কর্মসূত্রে, যা বাঙালি যুবকেরা প্রায় ভাবতেই পারে না। ঘনাদা গড়পড়তা বাঙালির মতো আত্মকেন্দ্রিক নন তিনি জানেন তার সহযাত্রীকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য, তাই মিস্টার মার্টিনকে বাঁচাতে ড. নিশিমারার উপর সপাটে ঘনাদা ঘুসি চালান। অর্থাৎ বাক্য বলই শুধু নয়, ঘনাদার বাহুবলও প্রচণ্ড তাও আমরা জানতে পারলাম। গল্পের শেষে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের শুভ চেতনার জয় ও অশুভের বিনাশ ঘটালেন। সভ্যতার বিরুদ্ধে কল্যাণের বিরুদ্ধে যে অশুভ শক্তি সেই পরীক্ষাগারে তৈরি বিষাক্ত মশা এবং তার ডক্টর নিশিমারা দু'জনকেই নিজেদের কারণে শেষ হতে হলো। এই গল্পে আছে বাঙ্গালীর আড্ডা প্রিয়তা গল্প বলার ও শোনার চিরন্তন আগ্রহ, বাঙালির কল্পনাবিলাস, বীরত্ব; আছে বিজ্ঞান চেতনা যুক্তিবাদী মনোভাব, কল্যাণবাদী মনোভাব আর আছে মিথ্যা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

তথ্যসূত্র ঃ ১। বাংলা গল্প বিচিত্রা; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; প্রকাশ ভবন ২০১৫
২। শিশুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতিন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য, আভাপত্রিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা ১৯৮১
৩। বিজ্ঞান নির্ভর গল্পের ভূমিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অভ্যদয় প্রকাশ মন্দির, মহালয়া ১৩৭১
৪। E.E.Bleilen, Science Fiction Writers,Charls Scriner's,New York 1982
৫। Science Fiction: the literature of ideas. WWW.writingworld.com(Archived)
৬। www.wikipedia.org ৭। www.mosquitomagnet.com
৮। 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্প' লীলা মজুমদার, দেশ ১৯৮৮
সহায়ক গ্রন্থ ঃ ১। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র - ড. বিথীকা চৌধুরী, অক্ষর পাবলিকেশনস্, ২০০৮
২। 'অন্যকথা' সাহিত্য পত্রিকা, সপ্তম সংখ্যা - ১৪১১ ৩। 'গল্পমেলা' সাহিত্য পত্রিকা - ২০১১
৪। 'আজকের কাদম্বরী' সাহিত্য পত্রিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা - ১৪১১
৫। 'জ্বলদর্চী' সাহিত্য পত্রিকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা, জানুয়ারি-ডিসেম্বর - ২০০৩
৬। 'ইতিবাচক' সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা - ১৯৯৮

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ

সুব্রত গোস্বামী, শিক্ষাকর্মী

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যুগপুরুষ। ভারতীয় সমাজ জীবনে তার আবির্ভাব উল্কার মতো এবং তার তিরোধানও উল্কার মতোই। তথাপি স্বামীজী তার স্বল্প আয়ুষ্কালে ভারতীয় সমাজ জীবনে বিশেষ করে যুব সমাজে সুগভীর আলোড়ন তুলেছিলেন। তিনিই উপনিষদের ঋষিদের বাণীকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত' – অর্থাৎ 'ওঠো, জাগো এবং তোমার উদ্দেশ্যকে সফল কর'- 'Be awake and arise before the goal is achieved.'।

তিনি যুবদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী, শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের – নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না - নীচ জাতি, মুর্খ দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত তোমার ভাই।

'হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশিষ্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারণসী, ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমার মানুষ কর।"

স্বামীজির আহ্বানে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের যুবসমাজ আলোড়িত শিহরিত হয়েছিল। তাই দেখি স্বামীজির শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের জন্য বাংলার যুবকদের সাথে সাথে মাদ্রাজের যুবকেরা চাঁদা তুলে বা ভিক্ষা করে স্বামীজির যাতায়াতের পাথেয় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য স্বামীজির বাণী তাদের ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কারণ স্বামীজি বলেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয় বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি – এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত, সর্বত্রই তাঁহার হস্ত সর্বত্র তাঁর কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।

যুবকদের উদ্দেশ্যে স্বামীজি বলেছিলেন, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেষ্ঠ।' তাই সেই সময় যুবকেরা নানা প্রকার ব্যায়াম ও ফুটবল খেলা ইত্যাদিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। স্বামীজি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব, তাই তিনি মার্তৃভূমির উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ভবিষ্যতবাণী ছিল "আমি মানবচক্ষে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন। নারীদের সম্পর্কেও স্বামীজি ছিলেন উদার। তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশ – সে জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপনত ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি মূর্তির অবমাননা করা।"

দুঃখের বিষয় বর্তমান যুবসমাজ স্বামীজির কথা ভুলেই গেছে। তাই যুবকেরা নানা প্রকার অশিক্ষা, কুশিক্ষা নিয়ে মেতে রয়েছে। তাই সংবাদপত্র খুললেই যুবকদের নানা প্রকার দুষ্কর্মের খবর চোখে পড়ছে। তাই পুনরায় স্বামীজির বাণী স্মরণ করছি। 'আমি চাই এমন লোক যাহাদের পেশী সমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর উহার মধ্যে থাকিবে এমন একটি মন, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য মনুষ্যত্ব - ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।'

মানবতার নামে বিদ্রোহ ঃ
কুসংস্কার বিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার
ও সংশয়বাদী ঈশ্বর

অভিষেক আশ
ইংরেজি বিভাগ, পি.জি. প্রথম সেমিস্টার

তৎকালীন হুগলী অধুনা মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে সেদিন সকালে হৈচৈ। একটি এঁড়ে (পুরুষ) বাছুর জন্মেছে। রামজয় তর্কভূষণ তাঁর বাজার ফেরৎ পুত্র ঠাকুরদাসকে সেই খবর শোনালেন। তড়িঘড়ি গোয়ালে চললেন ঠাকুরদাস। রামজয় সহাস্যে বললেন – না। ওদিকে নয়। তোমার স্ত্রীর পুত্রসন্তান হয়েছে। সেই পুত্রই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবিষ্যতের বিদ্যাসাগর। জন্মতারিখ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০। এঁড়ে মানে পুরুষ, ছটফটে, একগুঁয়ে, খেয়ালী। বাছুর মানে গোবৎস। শিশুটি মোটা মাথার যেন 'যশুরে কৈ' (বন্ধুরা ঠাট্টা করত - কশুরে জৈ)। খর্বকায়, শ্যামবর্ণ, গাঁট্টাগোট্টা, চঞ্চল এবং তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।

দরিদ্র ঠাকুরদাস যজমানী ও পণ্ডিতি শেখানোর স্বপ্নে ৮ বছরের ঈশ্বরকে নিয়ে পদব্রজে পাড়ি দিলেন বীরসিংহ থেকে ৫২ মাইল দূরে কলকাতার পথে। বালক ঈশ্বর 1 থেকে 10 সংখ্যার ধারণা করে নিল। পরের বাড়ি থেকে, রাতে গ্যাসলাইটে পড়ে, দৈনিক রান্না, বাসন মাজা করে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত ভাষার নানান শাখা জ্ঞান অর্জন করে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনুধাবনের কক্ষপথ যে বিচিত্রতায় ভরপুর হবে তা অবিসংবদিত ভাবে সন্দেহাতীত। তাঁর জীবদ্দশায় তাকে বোঝা সীমিত ছিল; এমনকি কোনো দৃষ্টিকোণে তাঁর উদ্যোগসমূহ গ্রহণীয় হবে তাও তাও সন্দিগ্ধহীন হয়ে ওঠেনি। এমনকি তার দানছত্রে বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর ও কৃপাসাগর এই ত্রয়ীর বিবরণে ওঁর ভাবমূর্তি সঠিকতায় যে বজায় থাকছে না তাও কয়েকটি বিশ্লেষণে বর্তমানে প্রস্ফুটিত হয়ে চলেছে। তিনি বাংলার নবজাগরণের আলো, আমৃত্যু কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি শুধু বিদ্যার আলো ছড়িয়ে যাননি বরং নিজ জীবনে প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানবতার আদর্শ।

তা রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন ? — শোনেননি তো। আর কি করেই বা শুনবেন ? আজকের লোক তো তিনি নন। প্রায় একশো ঊননব্বই বছর আগে এই অখন্ড বাংলার 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় তাঁর নামটি দেখা গিয়েছিল। আমিও অবিশ্যি এই 'মহাশয়' ব্যক্তিটি সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেবল তাঁর নামটি ছাড়া। তাঁর একখানি কৃতিত্বের কথা বলতে পারি এবং সেটি ঐ 'জ্ঞানান্বেষণ'এর দৌলতেই। ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল 'ময়াপাড়ায়'। কে জানে সেটা কোথায়! জানা যায় তিনি বাষট্টিখানি বিবাহ করেছিলেন।

১৮৩৬ সালের ২৩ শে এপ্রিল, বাংলা সন ১২৪৩ সালের ১২ বৈশাখ তারিখে উক্ত 'জ্ঞানান্বেষণ' জানাচ্ছেন, কুলীনদের বাহু বিবাহ। একটি দীর্ঘ তালিকায় সাতাশ জন বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণ এবং তাদের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ঐ তালিকার শীর্ষে রয়েছেন পূর্বোক্ত রামচন্দ্র চাটুয্যেমশাই এবং সবচেয়ে কম বিবাহ করেছেন পতসপুরের গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিবাহের সংখ্যা মোটে আটটি।

বহুবিবাহ যে একটি কুপ্রথা, সে বিষয়ে অনেক প্রগতিমনস্ক ব্যক্তিরাই সেদিন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করতে তো তেমন কারোকে দেখা গেল না; একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া। বিদ্যাসাগর নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই বহুবিবাহের কুফলের অন্তহীন গল্প। বিধবা মহিলাকে আইন সংগত করা এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এই পণ্ডিতটি। তার ভাষায় 'কুলীনরা কেবলমাত্র অর্থের জন্য বিবাহ করে .... নামমাত্র বিবাহে নারী বঞ্চিত হন জীবনের সকল সুখ থেকে, তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান।'

তিনি ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর এই প্রথা রদ করার জন্য ২৫ হাজার জন স্বাক্ষরযুক্ত পিটিশন করে সরকারের কাছে আবেদন করেন। এরপর ১৮৬৬ সালে পুনরায় আবেদনপত্র, ডেপুটেশন এবং বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আইনি উদ্যোগ হয়, তবে ব্রিটিশ সরকার ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে আইন রক্ষা করতে দ্বিধা করেন। এ ব্যাপারে সরকার একটি কমিটি গঠন করে যেখানে বিদ্যাসাগর ছিলেন একমাত্র সদস্য যিনি স্পষ্টত বহু বিবাহ আইন নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বহুবিবাহ সম্পূর্ণ আইনত বন্ধ হয়নি তার জীবদ্দশায়। তবে তিনি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে গণজাগরণের আলো ছড়িয়ে দেন। তিনি প্রকাশ করেন 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক পুস্তিকা, যাতে তিনি সতর্ক যুক্তি, বাস্তব সামাজিক কুফলের বিবরণ, মহিলাদের দুরবস্থা ও কৌলিন্য প্রথার অপব্যবহারের তথ্য তুলে ধরেন।

১৯৫৫ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন'-এ বহুবিবাহ ভারতে নিষিদ্ধ হয়, যা তাঁর আন্দোলনের বহু পরে, তাঁর লেখা পুস্তকের মাধ্যমে যে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরী হয় তা এক নতুন নবজাগরণের সোচ্চার করে। বিধবা নারীর জীবন বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদীন ধরে এক দুঃসহ কষ্ট, অবহেলা ও নির্যাতনের গল্পে আচ্ছন্ন ছিল। পতির মৃত্যু মানেই নারীর জীবনে নেমে আসত অন্ধকার, আতঙ্ক, চরম অপমান। সামাজিক নিয়ম নীতি তাঁদের বেঁচে থাকা পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যার মতো কষ্ট দেয়। তাদের উপর চাপানো হতো কঠোর নিয়ম। সাদা পোষাক, ছোট চুল, অলংকার ও সাজসজ্জা বর্জন, সাধ্যের বাইরে কঠিন উপবাস, নিরামিষ আহার, এমনকি পিঁয়াজ-রসুনও নিষিদ্ধ ছিল। এই কষ্ট সইতে না পেরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। যে কারণ বশত অজান্তেই তার অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল। প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন - রাধাকান্ত দেব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভা বিধবা বিবাহ বিরোধী পুস্তক ও প্রচার এবং সরকারী দপ্তরে বৃহৎ স্বাক্ষর আন্দোলন করেন, তারানাথ বাচস্পতি বা তর্কবাচস্পতি বিধবা বিবাহের অর্থশাস্ত্র বিরোধিতা এই নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন, এছাড়াও বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইত্যাদি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবমূল্যায়ণ করতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বাদ পড়েননি। তিনি সাহিত্য মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে 'বৃষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখে তীর্যক মন্তব্য রাখেন, 'যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পন্ডিত হয় তবে মূর্খ কে ?' বিধবা বিবাহকে কেন্দ্রীকরণ করে এমন এক সময় উৎপন্ন হয় যে তার প্রাণহানির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্র বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে হিন্দু ধর্মে বিধবা-বিবাহ স্বীকৃত। পরাশর সংহিতায় আছে –

"নষ্টে, মৃতে প্রপজ্যিতে / ক্লীবে চ প্রতিতে পতৌ;
পঞ্চপিৎ সু নারীনাং / পতিরগো বিধায়তে।"

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, পুরুষত্বহীন হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে কিংবা পতিত হলে স্ত্রীগণ পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। যার সমর্থনে 'তত্ববোধিনী' পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন 'ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করতে পারে তবে কোন স্ত্রী কেন স্বামীর মৃত্যুর

পরে বিবাহ করতে পারে না ? অক্লান্ত পরিশ্রমে এক হাজার স্বাক্ষর সম্মিলিত একটি আবেদনপত্র সরকারের দপ্তরে জমা করেন। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই 'হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ' আইন লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে পাশ হয়। লর্ড ডালহৌসি বিলটি খসড়া করেন এবং লর্ড ক্যানিং আইনটি সরকারীভাবে পাশ করেন। তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরও বিদ্যাসাগরের মত সমর্থনে সহানুভুতিশীল ছিলেন। সবার ধারণা ছিল বিধবা বিবাহ আইনানুগ হলেও বাস্তবে এটা সম্ভবপর হবে না কিন্তু সেটাও মিথ্যা ছিল।

নথিপত্র অনুযায়ী জানা যায়, সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬-র ৭ই ডিসেম্বর। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী কালীমতী দেবী। স্থান - বিদ্যাসাগর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা।

বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বিধবা কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। পাত্রী ছিলেন ভবসুন্দরী দেবী, যিনি হুগলির খানাকূলের কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কিশোরী বয়সেই বিধবা হন। নারায়ণ ভবসুন্দরীর প্রেমে পড়েন, বাবার পরামর্শে সমাজের প্রথা ভেঙে সাহসে এই বিবাহ করেন।

উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে নারী শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের ভাবনা ছিল বেশ দুর্ভাগ্যজনক ও কুসংস্কারপূর্ণ। সামাজিক ধারণা ছিল 'মেয়েরা পড়াশোনা করলে বিধবা হবে'। 'নারীর পড়াশোনা অশুভ' কিংবা 'নারীর শিক্ষার দরকার নেই - তাদের কাজ গৃহস্থলী ও সন্তান প্রতিপালন। 'বিদ্বেষ, ভয় ও ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে নারী শিক্ষা ছিল উপেক্ষিত। নারীদের যদি প্রাথমিক শিক্ষাটুকু না থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের কি শেখাবে ? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব চেষ্টায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন 'নারীও মানুষ, তাদেরও স্বাধীন চিন্তার অধিকার আছে। সমাজের কুসংস্কার জড় মনোভাব থেকে নারীদের মুক্তি করার জন্য শিক্ষা থাকতেই হবে, এটাই মানবতা, এটাই উন্নতির চাবিকাঠি।

১৮৬৪ সালে প্যারিচরণ সরকার 'সুরাপান নিবারণী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিতে বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় সদস্য। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমাজে মদ্যপান কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও সচেতনতা বৃদ্ধি। তিনি ইংয়বেঙ্গল দলের উদাসিন আচরণ ও মদ্যপানের প্রবণতা মোটেই পছন্দ করতেন না।

বিদ্যাসাগর অবশ্য বিভিন্ন সময় ঈশ্বর ও ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে তাকে এক কথায় আস্তিক বা নাস্তিক না বলে সংশয়বাদী বলা চলে। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ভ্রাদিমির লেলিনের কথায় 'Oh, my God' বলতেন। তার মানে কি তিনি আস্তিক বা ঈশ্বরবাদী ?

উদাহরণটি দেওয়া যায় এই কারণে যে, বিদ্যাসাগর ও সেকালের রীতি অনুযায়ী চিঠির উপরে লিখতেন 'শ্রী শ্রী হরিঃ শরণম্'। বিদ্যাসাগরের চিঠিতে এই 'শ্রী শ্রী হরিঃ শরণম্' পাঠ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। কেউ কেউ চিঠুর এই শিরোভূষণকে বিদ্যাসাগরের আস্তিকতার সাক্ষ্য হিসাবে হাজির করেছেন। আবার অনেকে তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীনতা লক্ষ্য করে তাঁকে নাস্তিক বলেছেন। তাঁর নিজের উপর উপবীত ধারণেও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ জানিয়েছেন একদিন রামতনু লাহিড়ীকে রাস্তায় হন্ হন্ করে যেতে দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গো কোথায় চলেছ ?' রামতনু লাহিড়ী বললেন, 'আজ্ঞে পরিপারের কথায় বামুন ঠাকুর খুঁজতে বেরিয়েছি'। বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, 'বাপের কথায় পৈতে গাছটি রাখতে পারলে না, আর এখন পরিবারের কথায় বামুন ঠাকুর খুঁজতে বেরিয়েছো ?' রামতনু লাহিড়ীর প্রতি এই তীব্র শ্লেষে তাঁর মনের কথাটি ফুটে ওঠে। আমাদের মনে হয়, তাঁর নিজের উপবীত ও টিকি রক্ষা তাঁর কোনা ধর্মীয় প্রতীক নয়, পৈতৃক প্রথার প্রতি চাদর এবং তালতলার চটির মতো স্বাজাত্যভিমানের প্রতীক। বিদ্যাসাগর অবশ্য বিভিন্ন সময়ে

ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে তাঁকে এক কথায় আস্তিক বা নাস্তিক না বলে সংশয়বাদী বলা হয়। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কোনো মতামত প্রকাশ করেননি।

পরবর্তীকালে স্বামীবিবেকানন্দ একটি ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন। একবার পুরীর কাছে বঙ্গোপসাগের জাহাজডুবির ফলে প্রায় সাত-আটশো নরনারী, বালক-বালিকা মারা যায়। এই খবরে দুঃখিত উত্তেজিত বিদ্যাসাগর স্বয়ং ভগবানের উদ্দেশ্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। 'দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে ডুবাইলেন। আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া সাত-আটশ লোককে একত্রে এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। দুনিয়ার মালিকের কী এই কাজ! এই সকল দেখিলে, কেহ মালিক আছে বলিয়া সাহসা বোধ হয় না।'

আবার একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার আর কী দরকার ?' চেঙ্গিস খাঁ লুটপাট আরম্ভ করলে, অনেক কোলেকে বন্দী করলে, ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। সেনাপতিরা এসে বললে, এদের খাওয়াবে কে ? সঙ্গে রাখলে বিপদ আবার ছেড়ে দিলেও বিপদ। চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে আর কি করা যাবে, ওদের সব বধ করো। কচাকচ করে কাটিবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার তো কোনো উপকার হলো না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজত্বে এইরকম নির্মম ঘটনার কার্যকারণ খুঁজে পেতেন না। সুতরাং মানববাদী বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই তীব্র অভিমত প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এখনও এরকম ঘটনা তো বটেই, এর চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে মক্কায় হজের সময় ঢিল ছুঁড়ে কাল্পনিক শয়তা মারতে গিয়ে শ'তিনেক লোক ভিড়ের মধ্যে পায়ের চাপে মারা গেল। প্রায় তো এমন ঘটনা ঘটে। যাঁর করুণার জন্য মানুষ পাগলের মতো ছুটে যায়, তিনি কিন্তু চোখ বুজে বসে রইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'এই মহাপুরুষ (বিদ্যাসাগর) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহারে ও রোগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন।' ('স্বামীজির সঙ্গে হিমালয়ে' – ভগিনী নিবেদিতা) অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের কাছে ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে মানব চিন্তা ও সমাজ চিন্তাই বড়ো ছিল।

তবু নাস্তিকদের মতো বিশ্বাসের শেষ দরজাটি তিনি বন্ধ করে দেননি, আধ্যাত্ম চেতনার অভিমুখে মনের একটা দরজা তিনি খোলা রেখেছিলেন। তাঁর নিজের কথাটাই এখানে উদ্ধৃত করা যাক - 'এই বিধাতা ও বিধান এতই গভীর রহস্যময় যে, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি আরও অনেক উন্নত হলেও তার যথার্থ সন্ধান পেতে বহু বিলম্ব হবে।' এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি দেখে নেওয়া যাক শ্রী মহেন্দ্র গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন বাদুড়বাগানের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। কথার পর কথার মালা গেঁথে চললেন পরমহংসদেব। মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন সকলে। একদা শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্ম যে মুখে বলা যায় না। সব জিনিস এঁটো হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম এঁটো হয়নি। ব্রহ্ম যে কী আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি।

– বা! এটা তো বেশ কথা। বিদ্যাসাগর বললেন, আজ একটা নতুন কথা শিখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কাউকে বেশী শক্তি বা কম শক্তি দিয়েছেন ?

পরমহংসদেব বললেন, তা দিয়েছেন বইকী। সকল লোকের শক্তি কী সমান হতে পারে ? কোনোখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে একটি মশাল জ্বলছে। তিনি কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন ? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো ? অন্যের

চেয়ে তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে, তাই তোমাকে মানে, দেখতে আসে। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে। কিন্তু এ রজোগুণ - সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। তুমি বিদ্যমান, অন্নদান করছ; এও ভালো। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। মানুষ মনে করে , আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবছে এবার এসে সব পাহাড়টা নিয়ে যাবো। ক্ষুদ্র জীবরা এই সব মনে করতে পারে কিন্তু জানে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অজ্ঞাত। তবে বেদে, পুরাণে যা বলছে - সে কীরকম জানো ? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে, 'ও কি দেখলুম। কী হিল্লোল কল্লোল।' ব্রহ্মের কথাও সেই রকমই। সমাধিস্থল হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যা, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কী বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। একজন প্রশ্ন করলেন, সমাধিস্থ ব্যক্তি যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনি কি আর কথা কন না ?

রামকৃষ্ণ বললেন, যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে , ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করার পর মাতাল হয়ে আবার কখনো কখনো গুন গুন করে। পুকুরেতে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর হয় না। তবে আর এক কলসিতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়। এরপর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের প্রতি আবার বলেছেন. অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউয়ের ছেলে হলে ছেলেটিকে নিয়েই থাকে; ওইটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া আর সংসারের কাজ শাশুড়ি করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

যাইহোক, পরে এ প্রসঙ্গে তিনি বৈকুন্ঠ স্যান্যালকে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ। আমার মতো কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাঠে তাঁর বিদ্যাদান কর্ম উচ্ছেদ হয়, তাই আপন ক্যালণ মুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন। আবার দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের 'দয়া ও মায়া' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মায়া হল শুধু স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদের ভালোবাসা, আর দয়া হল সর্বভূতে ভালোবাসা। যেমন বিদ্যাসাগরের দয়া। এরকম যে কথাটি হয়তো সকলের নজরে পড়ে না - দয়ার চিত্ত শুদ্ধি হয় ও বন্ধনমুক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে বিদ্যাসাগর রাসমণির বাগানে না গেলেও ১৮৮৬র ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের সংবাদ পেয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ থেকে মনে হয় একবার সাক্ষাতেই রামকৃষ্ণের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নাড়া দিয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের বড়ো ছেলের দৌহিত্র ললিত চাটুজ্যে বিদ্যাসাগরের পরকালের তত্ত্ব নিয়ে কিছুটা হাসিঠাট্টা করেছেন। ললিত নাকি ওসব তত্ত্ব জানেন। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে ললিত, আমরাও পরকাল আছে নাকি ?' ললিত চাটুজ্যে বললেন, 'আছে বৈকি। আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো থাকবে কার ? একথা শুনে বিদ্যাসাগর হাসতে লাগলেন।

ডায়াবেটিস

“স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ডায়াবেটিস নিয়ে কিছু কথা”

জাসমিন আহমেদ
বি.এম.এল.টি., তৃতীয় সেমিস্টার

বর্তমানে ডায়াবেটিস সবচেয়ে আলোচিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। একে ‘Silent Killer’ ও বলা হয়। কারণ অনেক সময় ডায়াবেটিস শরীরে নীরবে ক্ষতি করলেও শুরুতে কোনো লক্ষণ বোঝা যায় না।

ডায়াবেটিস হলো এমন একটি রোগ যেখানে শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোন সঠিকভাবে কাজ করে না বা কম তৈরী হয়। ইনসুলিন আমাদের খাবারের শর্করাকে শক্তিতে রূপান্তর করে। শরীরে ইনসুলিন না থাকলে অথবা কাজ না করলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস সাধারণত দুই প্রকারের।

টাইপ ১ ডায়াবেটিস ঃ- সাধারণত শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, যেখানে শরীর একেবারেই ইনসুলিন তৈরী করতে পারে না। টাইপ ১ ডায়াবেটিসকে Juvenile Diabetesও বলা হয়।

টাইপ ২ ডায়াবেটিস ঃ- প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশী দেখা যায়, তবে এখন তরুণদের মধ্যেও বাড়ছে এই রোগের প্রবণতা। টাইপ ১ ডায়াবেটিসে শরীরে ইনসুলিন তৈরী হলেও শরীরে সেটা সঠিকভাবে কাজ করে না। একে Insulin Resistance বলে।

এছাড়াও ডায়াবেটিস-এর আরও অনেক টাইপ রয়েছে, যেমন –

(a) Prediabetes
(b) Gestational Diabetes
(c) Type 3c Diabetes
(d) Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA)
(e) Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY)
(f) Neonatal Diabetes
(g) Brittle Diabetes.

ডায়াবেটিস-এর কিছু লক্ষণগুলি হল –

১) বারবার প্রস্বাব হওয়া
২) অতিরিক্ত পিপাসা পাওয়া
৩) হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া
৪) চোখে ঝাপসা দেখা
৫) ক্ষতস্থান ঠিক হতে অনেক সময় লাগা
৭) বারবার রোগে আক্রান্ত হওয়া
৮) সবসময় ক্লান্তি অনুভব হওয়া

ডায়াবেটিস-এর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু টেস্ট এর নাম হল –

1. Fasting Blood Suger (FBS) : অন্তত ৮-৯ ঘন্টা খালি পেটে থাকতে হয়, তারপর Fasting Blood Sugar মাপা হয়।

2.Postprandial Blood Sugar (PPBS) : খাবার খাওয়ার ২ ঘন্টা পর Postprandial Blood Sugar মাপা হয়।

3. Random Blood Sugar (RBS) : যে কোনো সময় Random Blood Sugar মাপা হয়।
4. Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) : গ্লুকোজ খাওয়ানোর পর ব্লাড সুগার লেভেল বাড়ছে / কমছে তা দেখা হয়।
5.HbA1C : গত ২-৩ মাসের গড় ব্লাড সুগার লেভেল জানা যায় এই টেস্টে।

ডায়াবেটিস হলে কী কী সমস্যা হতে পারে –
হৃদরোগ ও স্ট্রোক ঃ ডায়াবেটিস এ হৃদপিন্ড এর ধমনীগুলো দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এর ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্টোক এর ঝুঁকি বেড়ে যায়।
কিডনিতে ক্ষতি ঃ ডায়াবেটিস এ কিডনি কাজ করার ক্ষমতা হারায়, ডায়ালিসিস বা প্রতিস্থাপনের দরকার হতে পারে।

চোখের সমস্যা ঃ চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও নার্ভের ক্ষতি, পায়ের সমস্যা, দাঁতের সমস্যা, লিভারের সমস্যা, ইনফেকশনের ঝুঁকি হতে পারে।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উপায় ঃ ডায়াবেটিস হলে পুরোপুরি সারানো সম্ভব না হলেও সঠিক জীবনধারা খাদ্যাভাস ও নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস ঃ - ১) খাবার সময়মতো ও পরিমিত পরিমাণে খাওয়া। ২) শাকসব্জী, ফল বেশী করে খাওয়া। ৩) মিষ্টি ও অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার কমানো। ৪) জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, তেল-ময়দা জাতীয় খাবার খাওয়া কমানো।
নিয়মিত ব্যায়াম ঃ ব্যায়াম শরীরের ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করা উচিত।
জীবনধারায় সচেতনতা ঃ (১) ধূমপান ও মদ্যপান থেকে এড়িয়ে চলা, (২) মানসিক চাপ কমানো, (৩) দীর্ঘ সময় বসে না থেকে মাঝে মধ্যে হাঁটা চলা করা বা কিছু কাজ করা উচিত, (৪) স্থুলতা সাধারণত Type-2 Diabetes এর ঝুঁকি বাড়ায়।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে, যারা ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত তাদের উচিৎ ডাক্তারের নির্দেশ মতো ঔযুধ খাওয়া, নিজে থেকে ঔষধ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়।
খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা ঃ একসাথে অনেক পরিমাণে না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া ভালো। মিষ্টি, সফ্‌ট ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলা উচিত।
রক্তে শর্করা নিয়মিত পরীক্ষা করা ঃ Fasting Blood Suger (FBS) Postprandial Blood Sugar (PPBS), Random Blood Sugar (RBS), Oral Glucose Tolerance Test (OGTT), HbA1C পরীক্ষা করা খুব জরুরী।
শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখা ঃ নিয়মিত হাঁটাচলা অথবা হালকা ব্যায়াম শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে।
রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ ঃ এগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্ট ও কিডনির সমস্যা বাড়তে পারে।

সৌন্দর্য ও আকর্ষনীয়তার ঊর্ধ্বে ড্যামসেলফ্লাই

ড. পথিক কুমার জানা
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

ড্যামসেলফ্লাই প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এক অপূর্ব আকর্ষণ। তাদের সুসজ্জিত রঙ ও নৈমিত্তিক উড়ান প্রকৃতির 'রত্ন' বা জীবন্ত শিল্পের মতো মনে হয়। ছোট বড় সকল বয়সের মানুষ এদের অনায়াসে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। উজ্জ্বল পোষাক পরিধান না করে ধীর গতিতে এগোলে সহজেই এদের কাছে যাওয়া যায়। সকাল বেলার মিষ্টি রোদ্দুরে কিংবা বিকেলের মনোরম পরিবেশের পুকুর, নদী, খাল ও বিলের ধারের ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদের উপর এদের প্রায় সময় খুঁজে পাওয়া যায়। এরা কিন্তু আমাদের মতো রোদ্দুরকে এড়িয়ে চলে না, তাই গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও এদের উড়ান সহজেই দেখা যায়। অনেক প্রকৃতিবীদ ও ফটোগ্রাফার প্রকৃতি সফরে এদের ছবি তুলতে অভিরুচি রাখেন।

এই পতঙ্গদের পৃথিবীর সব মহাদেশে পাওয়া যায়, কেবল আন্টার্কটিকায় এদের দেখা যায় না। ড্যামসেলফ্লাই সাধারণত ড্রাগনফ্লাইয়ের তুলনায় ছোট আকৃতির ও কোমল। বসার সময় এদের স্বচ্ছ ডানাগুলো পিঠের উপর ভাঁজ করা থাকে (অপরদিকে ড্রাগনফ্লাইয়ের ডানাগুলো সাধারণত দেহের দুপাশে ছড়ানো থাকে)। বাংলার জলাভূমির আশেপাশে ড্যামসেলফ্লাই এর বিচরণ লক্ষণীয়; লোকজন এদের 'ফড়িং' নামে চেনেন। এদের ঝলমলে ডানাগুলো সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে, আর এদের দেহ লাল, নীল, কালো, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি রঙে রঙীন হয়ে থাকে। এই উজ্জ্বল রঙ, সূক্ষ্ম আকৃতির দেহ, আর সেই সাথে এদের অতি বিশেষ উড়ান প্রকৃতিপ্রেমীদের গভীর মুগ্ধ করে।

ড্যামসেলফ্লাই জলজ নিম্ফ দশা থেকে অসম্পূর্ণ রূপান্তরের মাধ্যমে সরাসরি পরিণত পতঙ্গ হয়ে ওঠে। এরা অত্যন্ত জল নির্ভর; মিষ্টি জলের পরিবেশ পছন্দ করে। এরা সাধারণত হ্রদ, পুকুর, খালবিল, নদী ও ঝর্ণার জলে জন্মানো উদ্ভিদ লতায় বাস করে। বর্ষা মরশুমে জমে থাকা সাময়িক জলাশয় থেকেও নিম্ফ পাওয়া যায়। জলজ উদ্ভিদ সম্পন্ন পুকুরের পাড়ে ড্যামসেলফ্লাইয়ের বিচরণ সেই পরিবেশের স্বাস্থ্যের প্রতীক।

এরা অনেক সময়েই গাছের ডালে, পুকুরের পাড়ে বা জলাশয়ের গাছের ওপর শান্তির সাথে বসে থাকে। কিছু প্রজাতির পরিণত পতঙ্গরা খাদ্যের খোঁজে জলাশয় থেকে খানিক দূরেও ঘুরে বেড়ায়, তবে প্রজননের জন্য তারা অবশ্যই জলাশয়ের সংস্পর্শে থাকে। ড্যামসেলফ্লাইয়ের স্ত্রী প্রাণীরা উদ্ভিদের টিস্যুর মধ্যে বিশেষ ব্লেড সদৃশ ওভিপোজিটর দিয়ে ডিমগুলোকে স্থাপন করে। প্রজননের সময় পুরুষ পতঙ্গ স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরে থাকে; এই অবস্থানকে 'ট্যান্ডেম' বলা হয়। কিছু প্রজাতিতে স্ত্রী প্রাণীরা ডিম পাড়ার সময় প্রায়শই সম্পূর্ণভাবে জলের নীচে ডুব দিয়ে ডিম স্থাপন করে। সাধারণত জলজ ঘাসঝোপ, শালুক, শুশনি, কলমি, কচু, কচুরিপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের জলে নিমজ্জিত স্থানে যেমন পত্র ফলকে, পত্রবৃন্তে, কাণ্ডে, মূলে ডিম পাড়তে পারে। উদ্ভিদ অঙ্গের অভ্যন্তরে ডিমের স্থাপন এন্ডোফাইটিক ও ওভিপোজিশন নামে পরিচিত। এর ফলে ডিম জলের মধ্যে নিরাপদে থেকে ফোটে ও নিম্ফগুলি জলের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করে। নায়াড নিম্ফ জলাশয়ের তলদেসে বাস করে এবং মশার লার্ভা সহ অন্যান্য জলজ পোকামাকড় খেয়ে বেড়ে ওঠে। নিম্ফরা বহুবার খোলস ত্যাগ করে পরিণত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিছু প্রজাতির নিম্ফ ১৫ বার খোলস নির্মোচন করে এবং ৩ বছর পর্যন্ত জলজ অবস্থায় থাকতে পারে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক পতঙ্গের জীবনকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হয়। নায়াড নিম্ফ দশা শেষে এরা জলজ উদ্ভিদের গা বেয়ে জলের ওপরে উঠে আসে এবং ডানাযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কে রূপান্তরিত হয়।

ড্যামসেলফ্লাই প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় ক্ষুদ্র উড়ন্ত কীটপতঙ্গ শিকার করে, যেমন মশা, মাছি, মথ ইত্যাদি। জলজ নিম্ফ মশার লার্ভাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী খেয়ে থাকে। একটি ড্যামসেলফ্লাই দিনে প্রায় ১০০ টিরও বেশি মশা খেতে পারে। তাই প্রকৃতিতে এরা কার্যকরী প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসাবে পরিচিত, মানুষকে মশা জনিত রোগ (যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া) থেকে বাঁচাতে এদের অবদান অমূল্য। অনেক উদ্যানপ্রেমী ও পরিবেশবিদ পরামর্শ দেন পুকুরের মধ্যে অথবা বাগানে ছোট জলাধার তৈরী করে ড্যামসেলফ্লাইদের জন্য উপযুক্ত গাছপালা দিয়ে বাসস্থান বজায় রাখতে যাতে তারা আকৃষ্ট হবে, ফলে মশার সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। তবে এরা কিন্তু স্বজাতির প্রাণীদেরও ভক্ষণ করে, তাই এমন দৃশ্যও বিরল নয়।

ড্যামসেলফ্লাই বাস্তুতন্ত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক গবেষণায় উল্লেখ আছে যে ড্যামসেলফ্লাই পরাগায়নে অংশ নেয় এবং বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা নির্দেশ করে। এদের নিম্ফ ও পরিণত উভয় দশার শিকারীরা – যেমন ড্রাগনফ্লাই, ব্যাঙ, মাকড়শা, গিরগিটি, পাখি ইত্যাদি – এদের উপর খাদ্যের জন্য অনেকাংশে নির্ভর করে। অধিকাংশ পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ জলাশয়ে ড্যামসেলফ্লাইয়ের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। তাই এদের উপস্থিতি পরিবেশের সুস্বাস্থ্য নির্দেশ করে। বিপরীতে নদী-বিল বিলুপ্তি, জলাশয় সংকোচন বা দূষণের ফলে ড্যামসেলফ্লাইয়ের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, যা বাস্তুতন্ত্রের সংহতির অবনতির দিকটিকেই ইঙ্গিত দেয়।

তাই ড্যামসেলফ্লাই শুধুমাত্র সুন্দর নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও মানবস্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জলাশয় ও তার আশপাশের উদ্ভিদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করলে এই ক্ষুদ্র পতঙ্গের ভবিষ্যৎ ও রক্ষা হবে। এই প্রাণীগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য আমাদের অলস সময়ের বিনোদন হয়ে উঠতে বেশি সময় নেবে না, শুধু এদের একটু বাসস্থান দিতে হবে। শত পোকামাকড়ের রাজ্যে এদের অস্তিত্বই প্রকৃতির এক প্রকার বহুমূল্য বিরল সম্পদ, এদের সংরক্ষণের ভার আমাদেরই।

দেবী পক্ষ

কোয়েল ঘোষ
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ

অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আজকে তুলির একটু দেরিই হয়ে গেল। আজ শনিবার, রাস্তাঘাটে অন্যদিনের তুলনায় ট্রাফিকের চাপ একটু বেশিই থাকে বলে ওর মনে হয়। তার উপর দুর্গাপুজো একদম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতির সঙ্গে যেটা বাধ সেধেছে তা হল অবিরাম বৃষ্টি ... এবছর কলকাতায় এত বৃষ্টি হচ্ছে যে শেষ মুহূর্তে পুজোর আনন্দটাই না ফিকে হয়ে যায় ... যাই হোক বাড়ির একেবারে গেট অবধি আস্তে-আস্তেই, বৃষ্টির তেজটা আরও বেড়ে গেল। তুলি তাড়াতাড়ি করে গেট খুলে ছাতাটাকে হুকে ঝুলিয়ে রেকেই সোজা বাথরুমে দৌড়ালো। ফ্রেশ হয়ে রান্না ঘরে ঢুকে দেখল মিনতিদি খাবার করে দিয়ে চলে গেছে। বৃষ্টির বেগটা ক্রমশ বাড়ছে আর তার সাথে মাঝে মাঝেই তীব্র আলোর ঝলকানি দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আজ আবারও মনে হচ্ছে জল জমে যাবে বাড়ির সামনে... কাল রবিবার অফিস যাওয়ার তাড়া নেই এইটা ভেবেই ও কিছুটা আশ্বস্ত হয়। নিজের জন্য কফি বানিয়ে সঙ্গে কিছু চিপস নিয়ে তুলি ডাইনিং হলের সামনে টিভির সামনে বসে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে এরকম খুব খারাপ আবহাওয়া থাকলে টিভি, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট এইসব ব্যবহার না করাই ভালো। একটু ইতস্তত করে টিভিটা অন করল তুলি ... মনে মনে ভারতে লাগলো এই বৃষ্টির দিনে একটা কোনো ভুতের বা রহস্যের থ্রিলার সিনেমা চালালে কেমন হয়! বিভিন্ন চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একটা তীব্র বাজের আওয়াজ হয় .. . কিছুটা সাবধান হয়েই টিভিটা বন্ধ করে দেয় তুলি। কি করবে এখন ভাবতে ভাবতে মনে হয় একটা কোনো গল্পের বই পড়া যাক। বই পড়তে পড়তে কতক্ষণ কেটে গেছে সেটা মনে করতে পারে না ... হঠাৎ কলি বেলটা বেজে ওঠে! একটু থেমে থেমে তিনবার ..."এখন কে এলো ?" এটা ভাবতে ভাবতে কিছুটা ইতস্তত হয়েই দরজাটা খুলে দেয় .. দরজার বাইরে অতিথি হিসাবে যারা দাঁড়িয়ে আছে, দুঃস্বপ্নেও তুলি ভাবতে পারেনি এটা ঘটতে পারে .. পা টা যেন নিজের অজান্তেই মেঝের সাথে আটকে যায় ... ঘরের আলোগুলো আশ্চর্যজনকভাবে লো ভোল্টেজ হতে থাকে ... একটা তীব্র বিদ্যুতের ঝলকানি ... তারপরেই সেই কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, 'কি রে কতক্ষণ থেকে বেল বাজাচ্ছি! এমন ভূত দেখার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? আমরা তো পুরো ভিজে যাব ... ভেতরে ডাকবি না!' সামনের দু'তিনটে ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে সোজ ঘর ... তুলির সম্মতির অপেক্ষা না করেই সেই অতিথি দুজন ঘরে ঢুকে পড়ে।

তুলি কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরই গোঙানির মতো শুনতে লাগল। যে দু'জন আগন্তুক ঘরে এসেছে তাদের কাছে তুলি অত্যন্ত আদরের, স্নেহের মানুষ - তুলির দাদু ও দিদুন.. 'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব ? তারা তো' অনেক বছর আগেই... চেয়ারে বসে পড়ে দাদু বলে ওঠেন - 'কি রে দিদিভাই আর তো আমাকে ফোন করিস না ? দাদুকে বুঝি একেবারেই মনে পড়ে না ? বুড়ো মানুষ আমরা কি রোজ রোজ আসতে পারি বল!' আগের বারের চেয়ে এখন যেন দিদিভাই আরও লম্বা হয়ে গেছে। কি গিন্নি আমি ঠিক বলছি ? দিদা হেসে বলেন, 'একদমই তাই' ... তুলি দেখল দুটো প্যাকেট টেবিলের উপর রাখা। ওপর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্যাকেটগুলোর ভেতরে জামা কাপড় জাতীয় কিছু রয়েছে।... দিদুন বলে ওঠে, 'হ্যাঁরে মা, কেমন আছে ?' ঘরের আলোগুলো যেন আরও ম্লান হয়ে গেছে, বাইরে ভীষণ শব্দে বৃষ্টি পড়ে চলছে। সমস্ত শক্তি জড়ো করে তুলি চেষ্টা করে পাশে ঘরে ঢোকবার। ত্রস্ত পায়ে পাশের ঘরে এসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে তুলি। কিছুতেই দরজার ছিটকিনিটা লাগানো যাচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারে

ডাইনিং হল থেকে কেউ ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে... ভয়ে তুলি ঘরের মধ্যে বিছানার কাছে এগোতে থাকে, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তুলির মা আধশোয়া হয়ে বসে আছেন.. মনে হচ্ছে যন্ত্রণায় মাথার সমস্ত নার্ভগুলো ছিড়ে পড়ে যাবে। ঠিক এই সময় মা বলে ওঠে – ''কি রে ? তুই আমাকে এখনো ডাকিস নি কেন ?'' ''মা..'', শুধু এইটুকু শব্দই মুখ থেকে বেরোয় আর কিছু বলা হয়ে ওঠে না তুলির। ঘোর লাগা চোখে ও বুঝতে পারে বাইরের ঘরে মা, দাদু, দিদুন গল্প করছে... মনে হচ্ছে সময় যেন থেমে গেছে... সেই পরিচিত দৃশ্যপট, ভীষণ কাছের মানুষগুলোর সাথে সময় কাটানো... কত হাসি, কান্না, আদর, অভিমানের টুকরো টুকরো কোলাজ... তুলি কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারে ওর সারা শরীরে সেই ভয় জাগানো, অস্বস্তিদায়ক অবস্থাগুলো আর নেই... কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে তুলি এগিয়ে যায় ড্রয়িং রুমের দিকে। দিদুন ওকে দেখে বলে ওঠে, ''দেখ তো তোর পছন্দ হলো কিনা!''... এই বলে টেবিলের উপর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে তুলির দিকে বাড়িয়ে দেন... প্যাকেট খুলে তুলি দেখতে পায় তার ছোটবেলার খুব পছন্দের সেই পোশাকটা। মামার বাড়ি থেকে পাওয়া সেই প্রিয় জামাটা যেটা আজও আলমারিতে তোলা আছে... আর কোনোদিন পরা হবে না, আর গায়েও হবে না কোনোদিন... জামাটার উপরে তুলি হাত বোলাতে থাকে।

তুলির মা, দাদুর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ''তোমাকে যেটা আনতে বলেছিলাম মনে করে এনেছো তো বাবা ?'' মাথা নেড়ে দাদু কাঁধের ব্যাগ থেকে জুয়েলারির একটা ছোট ব্যাগ বের করে আনে... সেই ব্যাগের চেনটা টেনে মা ভেতরে বেগুনি রংয়ের রাংতা কাগজের প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর রাখে... ঘরের ম্লান আলোতেও জিনিসগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়... মার চুলের রুপোর কাটা, বল.. তুলি যেন নিজের মনে বলে ওঠে বিয়ের এই উপহার গুলো যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল... এই নিয়ে মাকে মন খারাপ করতে দেখেছিল অনেকবার — আজ আবার সেগুলোই টেবিলের উপরে পড়ে আছে।

মা বলে ওঠে, ''নাতনি তো চুল বড় করে রাখতেই চায় না... কি সুন্দর লাগতো এগুলো পরলে... আর কাটিস না বাবু...'' দিদুনও হেসে সায় দেয়.. হঠাৎ দাদু বলে ওঠেন, ''দিদিভাই আমাদের জন্য একটি জল নিয়ে এসো তো... খুব তেষ্টা পাচ্ছে...''

তুলি ধীর পায়ে এগোতে থাকে রান্নাঘরের দিকে। মাথাটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে যেটা হচ্ছে, যা দেখছে, সেটা কি আদৌ সম্ভব ?

তুলির ভালো নাম দীপান্বিতা... শ্যামা পূজার সময় জন্ম বলে মাবাবা আদর করে নাম রেখেছিলেন দীপান্বিতা.. সময়ের সাথে সাথে সেই আলো যেন তুলির জীবন থেকে ফিকে হয়ে গেছে। আসলে সব নামের আক্ষরিক অর্থ জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে না, বরং উল্টোটাই হয়... তুলির সাথেও সেটাই হয়েছে। সেবার পুজোর আগে আগেই ম্যালিগ্যান্ট ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হওয়ায় মাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়। খুব চেষ্টা করেও মাকে আর ধরে রাখা যায়নি। তাই এখন আর পুজো ভালো লাগে না। অথচ এক সময় বাবা, মা'র হাত ধরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেল ঠাকুর দেখার আনন্দটাই ছিল একেবারে অন্যরকম। সেই ত্রিভুজটা ই আর নেই ... এক সরলরেখায় তুলির জীবন এখন বয়ে চলেছে। এসব ভাবতে ভাবতে তিনটে গ্লাসে জল ভরে একটা ট্রে নিয়ে তুলি রান্নাঘর থেকে ড্রয়িং রুমের দিকে যায়। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পায় না। ট্রে টা নামিয়ে রেখি তুলি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে ছুটে যায় ... তুলি দেখতে পায় মা, দাদু, দিদুন হাঁটা শুরু করেছে। ভীষণ কষ্টে গলার কাছে যেমন কান্নাগুলো জমাট বেঁধে থাকে, সেইরকম গলাতেই তুলি বলে ওঠে, 'তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ ?' ..একি ? দরজাটা খোলা আছে তবুও কিছুতেই তুলি চৌকাঠ ডিঙাতে পারছে না। দিদুন বলে ওঠে, ''ভালো থেকো দিদিভাই – আমাদের তো চলে যেতেই হবে .. ওই দেখো তোমার বাবা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছে। এই প্রবল দুর্যোগে ট্যাক্সি বা কি ভাবে আসবে! কিন্তু তুলির চোখের সামনে সবাই আস্তে আস্তে ট্যাক্সিতে বসে হাত নাড়তে নাড়তে চলে যায়। তুলির ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও এক পাও নাড়াতে পারে না। ভীষণ ইচ্ছা হয় ওই ট্যাক্সির পেছনে দৌড়ে তাকে থামানোর কিন্তু সেটা সে পারে না। বাড়ির মেন গেটটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

ধড়পড় করে তুলি জেগে ওঠে, ও কি তাহলে এতক্ষণ কোনো স্বপ্ন দেখছিল, নিজের অজান্তেই হাত দুটো চলে যায় চোখের নীচে, গাল বেয়ে নেমে আসা সদ্য জলের ধারা মুছতে মুছতে ভালো করে তুলি তাকিয়ে দ্যাখে, ইজি চেয়ারে বসে বই পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ... মোবাইল ফোনটা নিয়ে স্ক্রিনে চাপ দিতে সময় দেখায় চারটে বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। বাইরে কোনো বৃষ্টির শব্দ নেই। জানালার পর্দা সরাতে হালকা কুয়াশা মাখা রাত ও ভোরের সন্ধিক্ষণএ প্রিয় শহরটা দাঁড়িয়ে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে এসে লাগে। হঠাৎ পাশের কোনো বাড়ির থেকে ভেসে ওঠে ছোটবেলার সেই খুব প্রিয় সুর "আশ্বিনের শারদ প্রাতে ..."

সঙ্গে সঙ্গেই তুলির মনে পড়ে যায় আজ মহালয়া। তখনো এফ.এম. আসেনি। রেডিওতে ওরা মহালয়া শুনতো। ছোটবেলার সেই নিয়ম আজও তুলি বাঁচিয়ে রেখেছে। মা-বাবার ফটোর সামনে টু-ইন-ওয়ান টেপ চালিয়ে দেয়। কিন্তু আজ কিছুতেই স্টেশনের সিগন্যালটা কানেক্ট হচ্ছিল না। গান শোনার শখ ওদের পরিবারের সবার। বুক সেলফ্ এর দুটো র‍্যাক এখনো অজস্র ক্যাসেটে ভর্তি। তার মধ্যে মহালয়ার ক্যাসেটও ছিল, বাবা এনে দিয়েছিল। খুব ব্যস্তভাবে র‍্যাকের মধ্যে সেটাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় তুলি। ব্ল্যাংক ক্যাসেটের কভার এর উপরে বাবার নিজের হাতে লেখা ..." শুভ শারদীয়া। ইতি বাবা"।

ক্যাসেটটাকে কপালে আলতো ছুঁয়ে তুলি টেপ রেকর্ডারের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। উৎকন্ঠা নিয়ে বসে থাকে, আদৌ এটা চলবে কিনা! একটু পরেই সেই পরিচিত স্তোত্র পাঠ বেজে ওঠে। মহালয়া শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে তুলি গতকাল রাতের ঘটনাগুলো মনে করছিল। সবকিছুতেই এতো স্পষ্ট আর জীবন্ত ছিল যাকে স্বপ্ন বলে মনে করতে মন সায় দেয় না। তেষ্টা পাওয়ায় তুলি ঘরের ফাঁকা বোতলটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। ফিল্টারে জল ভরতে ভরতে তুলি খেয়াল করে ক্যাবিনেট এর উপরে একটা ট্রে; আর তার উপর তিনটে গ্লাস রাখা ... বিস্ময়ে চমকে ওঠে তুলি ... ওরা আমার হাতে জল খেতে চেয়েছিল ...।

কন্যা সন্তান হওয়ায় আজ অব্দি পিতৃপুরুষ কে জল দান করা হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীর যা কিছু নেতিবাচক তাই অশুভ, আর এই অশুভ শক্তির নাশ করার জন্যই দেবীর আগমন হয়। স্বর্গ-নরক বলে আদৌ কিছু আছে কিনা সেটা জানা নেই তুলির, তবুও এই দেবী পক্ষের সূচনায় বহু যুগ ধরে চলে আসা গোঁড়া নিয়মটা তাকে ভাঙতেই হবে।

ভালোবাসার প্রিয় মানুষগুলো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে কন্যা সন্তানদের কি দুঃখ কম হয় ? তাহলে পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ করার সব দায় একমাত্র ছেলেদেরই বা নিতে হবে কেন ... ? ব্যস্ত হয়ে ফোনের ডায়াল প্যাডে আঙুল রেখে এক পরিচিত নম্বরে ফোন করে তুলি... "কাকু এই বছর থেকে আমিও তর্পণ করবো, গঙ্গার ঘাটে দেখা হবে। আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি।"

পূর্বপুরুষ

ড. অর্পিতা ত্রিপাঠী
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ

নিশুতি রাতে খুটখাট আওয়াজে ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল ব্রজবাবুর। তাঁর বাড়িতে তো চোরের আসার কথা নয়। কৃপণ কুলশিরোমণি খেতাবটা তো আর এমনি এমনি তিনি পাননি! যদিও বদ লোকে তাকে আড়ালে হাড় কেপ্পন ব্রজ বলেই ডাকে, তা তিনি জানেন। তবুও সে ব্যাপারে কিছু মনে করেন না বরং বেশ খানিকটা গর্ব অনুভব করেন।

বাড়িতে একাই। অকৃতদার মানুষ, ভয়ডর বিশেষ নেই। খাটের উপর চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আওয়াজ হয়েই চলেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে শেষমেস বললেন, 'দীনু নাকি র‍্যা ?'

চোর দীনু অল্প চমকে কাঁচুমাচু স্বরে বললে, 'এজ্ঞে আমিই বটে।'

'তা কি নিতে এয়েছিস ? কি পাবি বলে মনে হয় তোর ?'

এবার খানিকটা বিরক্তির সুরে বলল দীনু, – 'কিছুই যে পাবো না তা আমি ভালোই জানি! নেহাত তিনি বললেন, অমূল্য রতন সব রয়েছে যতন। আপনার বাড়িতে সেই অমূল্য রতনের খোঁজে আসা।'

'হা! হা! হা! হা! ....' ব্রজবাবুর আচমকা অট্টহাসিতে রাত খান খান।

দীনুও অপ্রস্তুত।

'তা তোর সেই তিনিটা কে বল দেখি ? আমি হলাম গিয়ে কৃপণ কুলতিলক ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঘরে অমূল্য রতন! তাও আমি নিজেই জানি না!'

দীনু বললে, 'আমি তো তাই বললাম। তিনি যে বিশ্বাস গেলেন না। শুধু বললেন, ওরে দীনু বাইরে ব্রজ কৃপণ বটে কিন্তু ভেতর ভেতর ভারী দিলদরাজ। কৃপণতা তার রাগে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, হিংসায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রসনা চরিতার্থতায়। তোদের মতো গরীবগুরবোদের জন্যই সেই কবে থেকে পায়রার ডিমের মতো হিরে দুখানা আগলে নিয়ে বসে রয়েছে তা সে নিজেই জানে না। যা যা আত্ম উপলব্ধিতে সাহায্য কর বাবা। এও এক মহৎ কাজ বটে। তা আমিও ভাবলুম, সারা জীবন চুরি-চামারি তো কম করলুম না। পাপ হয়েছে বিস্তর। তা সেসবের প্রায়শ্চিত্তের এক সুযোগ যখন পেয়েছি আর ছাড়ি কেন। তারওপর হীরের ব্যাপার স্যাপার।'

শুনতে শুনতে ব্রজবাবুর হাঁ খানা ক্রমেই বড় হচ্ছিল। রাগ যে তার নেই তা নয়, তবে করবেন কার উপরে। আর তাছাড়া রাগ, লোভ, ঈর্ষা, হিংসায় ধনক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে। সম্পদ বলতে পূর্ব পুরুষের গচ্ছিত

খুদ-কুঁড়ো, তা সে সবে হাত দেওয়ার সাধ্য দীনু কেন এই ত্রিলোচনপুরের কোনো চোরের নেই।

এতো কথার মধ্যে অবশ্য পায়রার ডিমের মতো হীরের কথাখানা তাঁর কানে বাজছিল বারবার। ঠিক কোন জায়গায় হীরে দু'খান আছে ? এ ব্যাপারে তোর 'তিনি' কি বলেছেন ? সন্দিগ্ধ চোখে বললেন ব্রজবাবু।

তারপর চোর দীনু আর কৃপণ ব্রজবাবু মিলে কুপী জ্বেলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিলে ঠিক সেই জায়গায় যে জায়গাটা দীনুর 'তিনি' বাৎলে দিয়েছিলেন।

পুরানো ঠাকুর ঘরের মেঝেটা খানিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে বেশ গলদঘর্ম হয়ে পড়লেন দু'জন। দীনুর অভ্যাস আছে কিন্তু স্থুলকায় ব্রজবাবুর তো আর তা নেই। তবে হ্যাঁ পরিশ্রম বৃথা গেলো না। সুন্দর সোনালী কৌটার মধ্যে পায়রার ডিমের মতো না হলেও দু'খানা হীরে পাওয়া গেলো।

ব্রজবাবুর চোখ চকচক করে উঠল! কিন্তু দীনু ওদিকে রাগত স্বরে বলতে শুরু করেছে, 'লোভ করবেন না কর্তা! হীরে আমি খুঁজে বের করেচি।'

প্রথমে লোভ হলেও হীরে দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে যান ব্রজবাবু। বলেন, 'তুই নিবি ? নে' গে যা! আমি কৃপণ মানুষ কিইবা করব এ নিয়ে ? সেই তো পুঁতেই রাখবো মাটির তলায়। আমার কোনো কাজে লাগবে এ।

এই কথা শুনবে তা আশা করেনি দীনু। অদ্ভুত মৃদু এক মিষ্টি আলো বেরোচ্ছে হীরে দুটি থেকে। ওই দিকে চেয়ে ঘোরলাগা গলায় দীনু বলল, 'আমি চোর কত্তা, ডাকাত নই। দিন কেটে যায় পেঁয়াজ পান্তায়। এই হীরে পেলে আমার দিনের শান্তির ঘুম উড়ে যাবে।'

কি করা যায় .... কি করা যায় .... চোর দীনু আর কৃপণ ব্রজবাবু সেই মৃদু হীরের আলোয় বসে ভাবতে থাকে, কিভাবে তারা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে!

কুপির আলো নিভে গেছে ততক্ষণ। ভোর হয়ে এলো। দুজনের মুখে এই ঘনঘোর দুশ্চিন্তা দেখে শ্মশ্রুগুম্ফের তলায় অল্প হাসেন ভুত-পূর্ব জমিদার ভূপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাহ্, ব্যাটা দীনুকে কাজে লাগিয়ে ভুল করেননি তিনি। মহাতস্কর দানশীল গরীবের বন্ধু শতছিদ্রের প্রপৌত্র সে। কিছু গুণ তো থাকবেই। তিনি জানেন, চোর আর কৃপণেতে মিলে হীরে দুটোর সদ্-ব্যবহাহার করবে এবার। হয়তো গ্রামে হাসপাতাল বসাবে অথবা স্কুল করবে বা অন্য কোনো উন্নতির কাজ করবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তাঁর সে হাসি অবশ্য কেউ দেখতে পায় না। প্রপৌত্র ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের দেওয়ালে ছবি হয়ে আছেন যে।

ডাওহিল স্টেশনের যাত্রী

ড. মিঠুন ব্যানার্জ্জী
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন কার্শিয়াং-এর একটি কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কলেজে যাওয়া আসা করতাম টয়ট্রেনে। পাহাড়ি পথে সেই ট্রেন যাত্রার রোমাঞ্চ এখনো আমার মনে শিহরণ জাগায়। কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। এমনই এক রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আজ শোনাব। সেই রাতটা ছিল অমাবস্যার রাত।

বারটা ছিল মঙ্গলবার। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েছিলাম বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট নাগদ। সঙ্গে ছিল আমার দশ বছরের সহকর্মী, অবিনাশ প্রধান। অবিনাশ কার্শিয়াংয়েরই বাসিন্দা, ওদের পরিবার এখানে পাঁচ পুরুষ ধরে বসবাস করছে। কার্শিয়াং শহর ওর হাতের তালুর মতোই চেনা। ওর কাছ থেকে শহরের নানা প্রাচীন ইতিহাস আর প্রচলিত গল্প শুনে শুনে আমিও গত দশ বছরে কার্শিয়াং শহরটাকে অনেকটাই চিনে ফেলেছিলাম। তবে ওই মঙ্গলবার রাতে আমরা যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা সারাজীবন ভুলতে পারবো না। চেনা কার্শিয়াং সেদিন হঠাৎ করেই আমার কাছে এক অচেনা জগতে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের কলেজ থেকে বাড়ি পর্যন্ত ৭ টি স্টেশন পড়ত – কিম্বার, এলিফ্যান্ট পাস, সুকনা, রংটং, টিনধাড়িয়া, সোনাদা, কার্শিয়াং। সেদিন কিম্বার স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে উঠতে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ে অন্ধকার অনেক আগেই নেমে এসেছিল। আশেপাশে কোনো পাখির ডাক, গাছের পাতার মর্মরধ্বনি - কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। পাহাড় যেন নিঃস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিদিনই আমরা ট্রেনের শেষ কামরায় উঠতাম, কারণ ওই কামরা থেকে নামলে বাড়ির রাস্তায় তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেত। সেদিনও আমি আর অবিনাশ শেষ কামরাতেই উঠলাম। কিন্তু আজ ট্রেনে অনেক যাত্রী থাকলেও চেনা অফিস ফেরত মুখগুলো দেখা যাচ্ছিল না। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো ট্রেন দেরি করায় নিত্যযাত্রীরা অন্য কোনো যানবাহন ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। আমরা যে স্টেশন থেকে উঠেছিলাম, তার পরের স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাতেই দেখলাম আমাদের কামরার সমস্ত যাত্রী নেমে গেলেন। স্টেশনটির নাম এলিফ্যান্ট পাস স্টেশন। সাধারণত এখানে ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কিন্তু আজ আশ্চর্যজনকভাবে ১৫ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সিগন্যাল বাতিটি জ্বলছে আর নিভছে। ড্রাইভার ও তাঁর অল্পবয়সী সহকারী দুজনেই অস্থিরভাবে সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অবিনাশ বলল, 'আজ মনে হয় পাহাড়ে বৃষ্টি হবে।'

আমি বললাম, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। দূরের পাহাড়ের গায়ে কালো মেঘ জমেছে।'

কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আশঙ্কা সত্যি হলো – হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও শুরু হলো। অবিনাশ বলল, 'দাদা, স্টেশনে নেমে একটা গাড়ি দেখতে হবে, এই ঝড়-বৃষ্টিতে হেঁটে বাড়ি ফেরা যাবে না।'

আমরা এইসব কথা বলতে বলতে দেখলাম আমাদের ট্রেনের কামরার আলো দুটো নিভে গেল। গত দশ বছরে এইরকম অভিজ্ঞতা আগে যে হয়নি তা নয়, অন্তত পঁচিশ-ত্রিশবার এমন আলো নিভে যাওয়ার ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তাই অন্ধকার কামরাতে যাত্রা করার জন্য বিব্রত না হয়ে আমি আর অবনিাশ কথা বলতে যাচ্ছিলাম। তবে সারা দিন কলেজে খুব পরিশ্রম হয়েছিল, তাই ট্রেনের দুলুনিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আমি অবিনাশকে বললাম, 'আজ তো স্টেশনে চা-ও খাওয়া হলো না। কলেজের কাজের চাপটাও বেশি ছিল, তাই মনে হচ্ছে ঘুম পাচ্ছে।' অবিনাশ হেসে বলল, 'দাদা, আপনি ঘুমিয়ে নিন। আমাদের স্টেশন এলে আমি আপনাকে ডেকে দেবো।'

অবিনাশের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল মোবাইলের রিংটোনে। দেখি, আমার ফোনটাই বেজে চলেছে। ট্রেনের কামরায় তখন একটিমাত্র আলো টিম টিম করে জ্বলছে।

কিছুদূরে দু'জন যাত্রী বসে আছে। কিন্তু অবিনাশ, যে আমার পাশে বসেছিল, সে কোথায় ? মোবাইলের স্ক্রিনে দেখি, অবিনাশই ফোন করেছে। রিসিভ করে বললাম, 'কোথায় তুমি ? আমাকে না ডেকে ট্রেন থেকে নেমে গেলে ?'

ওপাশ থেকে অবিনাশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনি কোথায় ? এখনও বাড়ি পৌঁছাননি ?'

আমি বললাম, 'আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি তো বলেছিলে, স্টেশন এলে ডেকে দেবে। আমাকে না ডেকেই নেমে গেলে ? কতদূর চলে এসেছি কে জানে ? দাঁড়াও, কামরায় যে লোক দুটো আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করি কোন্ স্টেশন আসছে।'

এই বলে অবিনাশের ফোন হোল্ড করে লোকদুটোর কাছে গিয়ে পরের স্টেশনের নাম জানতে চাইলাম। কিন্তু লোকদুটো মনে হল বাংলা জানে না, আমার কথা বুঝতে পারছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ট্রেনটা যে লাইন দিয়ে যাচ্ছে তার চারপাশ আমার চেনা কার্শিয়াং-এর পরিবেশ নয়। মনে হচ্ছে ট্রেনটা কোনো অন্ধকার টানেলের মধ্যে ঢুকছে।

অবিনাশ নিশ্চয়ই এই জায়গাটা চেনে, ওকেই জিজ্ঞাসা করি – এই ভেবে আবার ফোন কানে দিতেই অবিনাশের কণ্ঠস্বর খুব অস্পষ্ট শোনাল, কিছুক্ষণের মধ্যে ফোনটাই কেটে গেল। অবিনাশকে ফোন করলাম, কিন্তু অবিনাশের সাথে যোগাযোগ করা গেল না। আবহাওয়া খারাপ থাকলে পাহাড়ে এই সমস্যা প্রায়শই দেখা দেয়। নিরুপায় হয়ে আবার সেই দুই যাত্রীর কাছে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কউনসা স্টেশন আ রহা হ্যায় ?' লোক দুটোর একজন অস্বস্তিকর গলায় বলল, 'আপ কাঁহা যায়েঙ্গে ? ইয়ে ট্রেন ডাওহিল যা রাহা হ্যায়। বিচ মে কোই স্টেশন নেই হ্যায়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ডাওহিলে তো কোনো ট্রেনই যায় না, ওখানে রেললাইনই নেই! গত দশ বছর ধরে এই কার্শিয়াং শহরে আছি, বহুবার ডাওহিল গিয়েছি। কলেজের কাজেও গিয়েছি। কোনো রেলস্টেশন তো দূরের কথা, রেললাইনও চোখে পড়েনি।

লোকদুটোর অন্যজন এবার বাংলায় বলল, 'আপনি জানেন না, ডাওহিল পাহাড়ের টানেলের ভিতর দিয়ে ট্রেন যায়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ডাওহিল স্টেশনে পৌঁছায়। ওটা ব্রিটিশ আমলের পুরানো স্টেশন, সেখানেই এই ট্রেন দাঁড়াবে।'

আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি সত্যিই ট্রেনটা যে লাইনে যাচ্ছে, তার দু'পাশে পাইন গাছের জঙ্গল। মনে হলো এ তো ডাওহিলেরই জঙ্গল। দিনের বেলা দেখা সেই পাইন জঙ্গল অমাবস্যার রাতে যেন বহুগুণ রহস্যময় ও ভৌতিক হয়ে উঠেছে। আমি মনে মনে ভাবতে থাকলাম, ডাওহিল তো আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর, এখান থেকে এই ঝড়বৃষ্টির রাতে বাড়ি ফিরব কিভাবে ? সঙ্গে মোবাইল ছাড়া আর কোনো আলোও তো নেই।

মনে মনে ভাবলাম, অবিনাশ এখানকার স্থানীয় মানুষ ও নিশ্চয়ই জানবে, ওকে জিজ্ঞাসা করি। এই ভেবে ওকে ফোন করলাম। ভাগ্যক্রমে অবিনাশ ফোনটা রিসিভও করল। আমি জানতে চাইলাম, ডাওহিল স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, এখান থেকে কার্শিয়াং ফিরবো কিভাবে ? কথাটা শুনে অবিনাশ বলল, 'কোন্ স্টেশন বললেন ? ডাওহিল! আপনি ওদিকে গেলেন কি করে ?' আমি বললাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই বুঝতে পারিনি। ও বলল, ট্রেনের কামরাতে যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন। আমি বললাম, সে না হয় করব কিন্তু তুমি আমাকে না ডেকে নেমে গেলে কি করে সেটা আগে বল। অবিনাশ বলল, আমি তো ... অবিনাশের ফোনটা আবার কেটে গেল।

নিরুপায় হয়ে তখন ট্রেনের কামরার দুই রহস্যজনক সহযাত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য ঘুরে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই দু'জন লোক চলন্ত ট্রেন থেকে হাসতে হাসতে নেমে যাচ্ছে। তাদের পরনে পাদ্রীদের মতো পোশাক। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, আমি চলন্ত টয়ট্রেনের মধ্যে বসে পড়লাম। আতঙ্কে আমার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো।

এরপর কী হলো, ঠিক মনে নেই। চোখ খুলে দেখি, আমি শুয়ে আছি পাইন গাছের গভীর জঙ্গলের মধ্যে। চারিদিকের আকাশ ছোঁয়া পাইন গাছের থেকে পোকার ডাক ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘের গর্জন কানে আসছে। সামনে এক চেনা চেনা লাগা বিশাল বাড়ি। অন্ধকারের মধ্যেই বাড়িটার আকার দেখে টের পেলাম - ওটা একটা গীর্জা। গীর্জার দরজার সামনে সাদা পাদ্রীর পোশাকে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে না ? ভয় আর আতঙ্ক আবারও আমাকে গ্রাস করল। – এবার চিনতে পেরেছি, এ তো ডাওহিলের সেই পরিত্যাক্ত গীর্জা! এই গীর্জায় তো কোনো কাজকর্ম হয় না, মানুষ দিনের বেলাতেও এই নির্জন গীর্জার কাছে আসতে ভয় পায়। এই তো সেই গীর্জা যার সংস্কার করতে গিয়েছে যারা, তারা তো দু'দিনের মধ্যে মারা পড়েছে। তাহলে এই পাদ্রীরা কারা! তারা কি চায় ? চোখবন্ধ করে যখন এসব ভাবছি তখন হঠাৎ আমার হাতের আঙুলে শীতল একটি হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলে দেখি সেই দুই পাদ্রী আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

অপার্থিব এক হিসহিসে গলায় তাদের একজন বললেন, 'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এই মাঠে বসে থাকবেন না, আমাদের সাথে গীর্জার ভেতরে আসুন।' আমি তাদের কথায় কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, তাই বিনা প্রতিবাদে তাদের সাথে চলতে শুরু করে দিলাম। গীর্জার দরজার কাছে পৌঁছে দেখলাম আমার ফোনটা বেজে উঠল। অবিনাশ কল করছে। কিন্তু পাদ্রী দু'জন কোথায়! তারা কি গীর্জার ভেতর চলে গেলেন ? তা কি করে সম্ভব ? গীর্জার দরজা তো বন্ধ। মোবাইলের অস্পষ্ট আলোয় গীর্জার জানালা দিয়ে দেখলাম তারা গীর্জার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন। অবিনাশ ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে বলল, 'আপনি গীর্জার দিকে যাবেন না, জানেন না ওই গীর্জার দিকে কেউ যায় না।' তারপর ও যা বলল, তাতে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল।

অবিনাশ বলল, 'আপনি বলছিলেন, আমি আপনার পাশে ট্রেনে বসেছিলাম ? আপনাকে না ডেকেই ট্রেনের বগি থেকে নেমে গেছি। দাদা, আমি তো আজ কলেজেই যেতে পারিনি। বাড়িতে আত্মীয়রা এসেছিলেন, সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার কান গরম হয়ে যাচ্ছিল, মনে পড়ছিল – সত্যিই তো আজ সারাদিন আমি কলেজে অবিনাশকে দেখিনি। ছুটির সময় গেটের বাইরে ওর সাথে দেখা হয়েছিল। অবিনাশের ফোনটা কেটে গেল। গীর্জার ভেতর তখনও দুই পাদ্রীকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল তারা আমাকে গীর্জার ভিতরে নিয়ে যেতে চাইছেন। অবিনাশকে ফোন করে আতঙ্কিত কণ্ঠে বললাম - 'আমি কোন্ দিকে যাব ? অন্ধকারে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' অবিনাশ বলল, 'আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, এক পাও এগোবেন না, আমি লোকজন নিয়ে আসছি।' আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

গীর্জার ভেতরে বিদ্যুতের আলোতে আবারও দেখলাম দু'জন পাদ্রী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল তারা কিছু বলতে চান, ক্রমশ আমার আকাঙ্খা বাড়তে থাকল, মনে হতে লাগল – যাই না একবার গীর্জার ভিতরে, শুনিই না কি বলতে চান। কিন্তু অবিনাশের সাবধানবাণী মেনে পড়ল তাই গীর্জার দিকে পা বাড়াতে পারলাম না। মনে মনে ভাবতে থাকলাম – 'অবিনাশ কখন আসবে ? এখান থেকে কি বেরোতে পারবো না ? ... নাহ, আর পারছি না, এবার গীর্জার দরজার পাশের এই ছাউনিটার নীচে বসে পড়ি। ভেতরে না গেলেই তো হল। এই বলে আমি গীর্জার মধ্যে না গিয়ে তার বাইরের দিকে একটা ছাউনির নীচে বসে পড়লাম।

কখন যে সেখানে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখলাম অবিনাশ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে স্থানীয় পুলিশ অফিসার ও দু'জন কনস্টেবল। পাশে একটি ব্যাগ, তার উপর একটি চিরকুট। চিরকুটটি হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে – গীর্জার সংস্কার করার জন্য এই ব্যাগে কিছু অর্থ আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম। দয়া করে গীর্জাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করুন। আমাদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি লাভ করবে যখন এই গীর্জার সংস্কার হবে।

‘জামাতা’ -পূজা

গৌরব মাইতি
অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে গৈরিকের মা শুধোলেন - ‘কি রে, বাজার যাবি কখন ? দাদু-দিদা ফোন করেছিল একটু আগে, বলেছে কাল বাড়িতে একটু মাটন রান্না করতে। তোর বাবা খুব ভালোবাসে তো তাই।’ অগত্যা দুই কন্যার সাথে খেলা থামিয়ে মা’য়ের কথামত বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়ল গৈরিক। আগামীকাল জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে মাংস দোকানে এই বেলাতেও লম্বা লাইন। পরিচিত এক দোকানদার কাকু তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি গোরা! এতো দেরি করে বাজার পানে ? জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে নাকি ? কার জন্যে ?’ গৈরিক হেসে উত্তর দিল – ‘হ্যাঁ কাকু, জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে একটু দেরি করেই, তবে আমার জন্য নয়। আমার এখনও জামাই আসতে ঢের দেরি, দাদু দিদা মিলে মা’কে বাবার জন্য মাংস রান্না করতে বলে দিয়েছিল আগামীকালের জন্য। তাই তা কিনতে আসা।’ এমনিতে এই ব্যাপারটা গৈরিকের কাছে খুব একটা পছন্দের বিষয় নয় আর তার কারণটা তার মত আরও অনেকের কাছে খুব সহজেই অনুমেয় - ঐ হৃদয়বিদারক গোঙানি। যাই হোক, মনে মনে RIP জানিয়ে গৈরিক পরিচিত দোকানদারকে বলল, ‘রান এর দিক থেকে দেবে’।

হঠাৎ সে শুনল, তার পেছনেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তাকে বলছেন - ‘রান-এর মাংস কি বেশি সুস্বাদু হয় বাবা ?’ গৈরিক হকচকিয়ে ওনার দিকে ফিরে তাকাতে উনি বললেন, ‘আসলে বাবা, আমি এর আগে কখনো মাংস কিনতে আসিনি, খুব একটা খাইও না বললেই চলে, বাড়ির জন্য অন্য কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিতাম। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, কাল আমার জামাই বাবাজীবন আসবে প্রথমবার জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, খাসির মাংস ছাড়া কি চলে বলো ?’

গৈরিক ওনার অবয়ব, পরিস্থিতি স্বচক্ষে একবার পর্যবেক্ষণ করে বলল, - ‘আচ্ছা কাকু, আপনি চিন্তা করবেন না, আপনাকে ভালো মাংসই দেবে, রান ছাড়াও ভালো মাংস হয়, আসলে এটা পছন্দের উপর নির্ভর করে। আপনি কতটা নেবেন বলে দিন, আমি বলে দিচ্ছি, ভরসা করতে পারেন।’

গৈরিকের মাংস কেনা হয়ে যাওয়ার পর’ও একটু অপেক্ষা করল যতক্ষণ না ওনার পালা আসছে। উনি ততক্ষণে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা নির্দেশ লাউড্স্পীকার অন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনছেন মন দিয়ে। স্পষ্ট ভেসে আসছে কথাগুলো, লিচু আনবে ভালো দেখে, আর বাজারের সেরা আম যা পাও, সাথে ক্ষীর দই আর রসমালাই, আর লেভেল ক্রসিংয়ের গায়ে যে বড় কাপড়ের দোকানটা আছে ওখানে গিয়ে বলবে – Polo বা Peter England এর ভালো কোনো টি-শার্ট দিতে XXL সাইজের।

ওনার পালা এলে মাংসটা গৈরিকই বলে দিল দোকানদারকে ওনার জন্যে। পাঁজরার নরম মাংস,

রান-এর একটু, আর গর্দানের নিচ থেকে দিতে বলল অল্প মেটের সাথে। প্লাস্টিকটা ওনার হাতে দিয়ে বলল টাকাটা মিটিয়ে দিতে। দেখল, উনি একটা পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল বের করে গুনছেন এক...দুই...করে। টাকা গুনতে গুনতেই গৈরিককে বললেন, 'আড়াই ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে যাব, মাংসটা খারাপ হয়ে যাবে না তো ?' গৈরিক হেসে বলল, 'না কাকু, খারাপ হবে না, আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান।' উনি দাম মিটিয়ে দোকান থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন – 'সেই সকালে বেরিয়েছি জানো, টিউশনে পড়িয়ে এই বাজারে এলাম, চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। যেমন চারপাশ গরমে গনগন করছে, তেমনি আগুনে দাম বাজারের সবকিছুতে। কিন্তু মেয়ের বাবা তো, এটুকু তো করতেই হবে বলো। জামাই আমার SAI অফিসে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করে জানো, কলকাতায় থাকে, রাজাবাজারে 2BHK ফ্ল্যাট রয়েছে, আমার মেয়েও তাই খুব খুশি, ওর শ্বশুর-শাশুড়িও বলে বৌমা সারাক্ষণ আমরা কি খাবো, কি দরকার লাগবে এসব নিয়েই মগ্ন।'

গৈরিক ওনার সাথেই বাজার থেকে বেরোতে বেরোতে বলল – 'কাকু, চা খাবেন ? এই সামনের দোকানে ভালো চা বানায়।' তারপর, এক কাপ চা নিয়ে ওনাকে দিতে গিয়ে দেখল, ওনার চোখের কোণটা চিকচিক করছে — গৈরিকের বুঝতে বাকি রইল না অনেক না-বলা কথাগুলো। পঞ্চাশ টাকার খুচরো করাতে গিয়ে আবার কথা শুনতে হতে পারে এই ভেবে ছ'টাকা সে নিজেই দিয়ে দিল। উনি বাধা দিতে গেলে, গৈরিক ওনার হাতটা ধরে বলল, 'ঠিক আছে কাকু, আপনি অন্য কোনোদিন দেখা হলে দিয়ে দেবেন।' অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসে বাঁক নেওয়ার মুখে পেছনে তাকাতে লক্ষ্য করল, মানুষটা ভাঁড় হাতে চেয়ে রয়েছেন এদিকেই।

ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরল গৈরিক। কেউ ফোন করছে তাকে। পকেটে রাখা মোবাইলে বেজে উঠল রিংটোন — ''**কিসি কি মুসকুরাহাটো পে হো নিসার**...''।।

অন্যান্য

২০০ বছর পরের ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

(একটি কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক রচনা)

ড. সৌম্যকান্তি হোতা
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ

সময় বদলায়, সভ্যতা বদলায়, কিন্তু কিছু চেতনা সময়ের স্রোতেও অমলিন থাকে।

খ্রিষ্টাব্দ ২২২৫। আজ থেকে ঠিক ২০০ বছর পরের ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় আর শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি এক বিশাল জ্ঞান-কেন্দ্র, যার নাম Debra Knowledge Sphere। এক সময়ের পরিচিত সবুজ ক্যাম্পাস আজও সবুজ, তবে সেই সবুজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। স্বচ্ছ ন্যানো গ্লাসে মোড়া সূর্যালোক থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। গাছ, জলাশয় ও প্রযুক্তি সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সহবস্থান।

শিক্ষার রূপান্তর। এখানে আর ঘন্টা বাজে না, রোল নম্বর ডাকা হয় না। শিক্ষার্থীরা বসে থাকে বিশেষ Quantam Learning Pod-এর ভিতরে। চোখ বন্ধ করলেই তারা প্রবেশ করে জ্ঞানের এক ভিন্ন জগতে – 'হলোগ্রাফিক শ্রেণিকক্ষে'। কেউ শিখছে ঋগ্বেদের গাণিতিক সূত্র, কেউ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর বিপ্লবীক চেতনা, কউে বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও মহাকাশ বসতির পরিকল্পনা। পাঠ্য বইয়ের জায়গা নিয়েছে চিন্তাশীল প্রশ্ন। এখানে শেখানো হয় –

কী জানো তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেন জানো শিক্ষক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই কলেজে শিক্ষক দুই ধরণের। মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষ শিক্ষকরা অভিজ্ঞতাও অনুভব শেখান, আর AI অধ্যাপকরা শেখান বিশ্লেষণ ও গভীরতা। সবচেয়ে সম্মানিত AI অধ্যাপকের নাম Kshudiram Bosu-Ω। এই কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তা তৈরী হয়েছে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবন, আদর্শ, আত্মত্যাগ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে। সে শুধু পড়ায় না, প্রশ্ন করে – 'তোমার শিক্ষা সমাজের জন্য কী করবে ?' অতীতের মুখোমুখি ভবিষ্যত। একদিন ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী অনির্বানী দত্ত কলেজের পুরানো অংশে গবেষণার সময় আবিষ্কার করেএকটি ২০২৫ সালের সার্ভার কক্ষ। সেখানে সংরক্ষিত ছিল পুরানো দিনের ছবি, নোটিস, পরীক্ষার খাতা এবং শিক্ষকদের হাতের লেখা মন্তব্য – 'ভালো করেছ','আরও চেষ্টা করো', 'মানুষ হও'। এই সাধারণ শব্দগুলেরা মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মানবিক শিক্ষার গভীর দর্শন। নতুন জাগরণ। সেই কলেজের কেন্দ্রীয় AI - সিস্টেম এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয়। 'প্রযুক্তি জ্ঞান দিতে পারে, কিন্তু মানবিকতা শেখাতে পারে শুধু মানুষ।'

এরপর থেকেই নুতন নিয়ম চালু হয়। প্রতি শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে একদিন মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করতেই হবে। গ্রামে শিক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক দায়িত্ব – সবই পাঠ্যক্রমের অংশ।

চিরন্তন পরিচয় - রাতের আকাশে যখন ডেবরা কলেজ আলোকিত হয়ে ওঠে তার কেন্দ্রস্থলে জ্বলজ্বল করে একটি নাম – শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। ২০০ বছর পরেও এই কলেজ মনে করিয়ে দেয় – শিক্ষা মানে শুধু ভবিষ্যত গড়া নয়, শিক্ষা মানে মানুষ হওয়া। ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি মহাবিদ্যালয় তাই আজও শুধুই একটি প্রতিষ্ঠান নয় – এটি একটি চেতনা, একটি আদর্শ, একটি জীবন্ত ইতিহাস।

গরীবের লকডাউন

পায়েল ঘোষ
ইংরেজি অনার্স, পি.জি., প্রথম সেমিস্টার

করোনার গরল থাবার হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে সরকারী তরফ থেকে লকডাউন জারি করা হয়েছে। মঙ্গলার্থে করা এই লকডাউন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা আবহে লকডাউন পর্বে চারিদিকে ঘটেছে নানা মর্মান্তিক ঘটনা। করোনা আক্রান্ত হয়ে যত না মানুষ প্রিয়জনদের হারাচ্ছে তার চেয়ে লকডাউনে অভাবে পড়ে না খেতে পেয়ে মানুষ তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে। চোখ খুললে, কান পাতলে শোনা যায় চারিপাশে ঘটা মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ। বকুলপুর গ্রামে রামু নামে এক ফুচকাওয়ালা ছিল, তার ছিল এক স্ত্রী ময়না। এক মেয়ে রমা ও এক ছেলে রাজু। খুব দরিদ্রতার মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে যেটুকু রোজগার হয়, তাতেই কোনোক্রমে সংসার চলে। বাড়তি খরচের কথা তারা ভাবতেও পারে না। গ্রামের এক প্রান্তে তাদের একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। সেখানে তারা চারজনে বহু কষ্টে বসবাস করে থাকে। ছেলে মেয়ে দুই ভাই বোনে গ্রামের স্কুলে পড়ে। আর সেইখানেই তাদের বাবা ফুচকা বিক্রি করে। টিফিনের সময় স্কুলের বাচ্চারা তার কাছে গিয়ে ফুচকা খায়। গ্রামের কতগুলো ধনী পরিবারের ছেলে তাদেরকে অপমানে করে এই কারণে যে তাদের বাবা ফুচকাওয়ালা। তাদের উপহাস করে। তারা বাড়িতে কিছু বলে না। পাছে, তাদের মা বাবা কষ্ট পাবে। মা রোজ সকালে রান্না করে সবাই যখন খেয়ে যে যার কাজে যায়, মা তখন যায় লোকের বাড়িতে কাজ করতে। এভাবেই বহু কষ্টের সংসারে অভাবের মধ্যে আনন্দ খুঁজে দুঃখ সুখের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের দিন চলত। সেই ক্ষীণ সুখের মধ্যে নেমে এল এক কালো

অন্ধকারের ছায়া। হঠাৎ সারা দেশ জুড়ে করোনা থাবা বসাল। আর সেই গরল থাবা এমনভাবে বসাল যে তার থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। যেহেতু রোগটা স্পর্শ, কফ, থুতুর মাধ্যমে ছড়ায় তাই সারা দেশের প্রধান জনসমাবেশ এড়াতে সারা দেশ জুড়ে ঘোষণা করল লকডাউন। আর এই লকডাউনের মধ্য দিয়েই তাদের পরিবারে এল চরম দুর্দশার দিন। রামু স্কুলের পাশে টিফিনে সেদিন ফুচকা বিক্রি করছিল। একটা ছেলে রামুর দোকানের সামনে এসে বসল। বলতে লাগল আজ শেষবারের মতো ফুচকা খেয়ে নিই। কাল থেকে লকডাউনের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুনে রামু একটু অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ এখন ছুটি কিসের ? গ্রীষ্মের ছুটি পড়তে এখনও অনেক বাকি। শুনে ছেলেটি বলল, তুমি জানো না! করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সরকারি তরফ থেকে এই লকডাউন। রামু তো তার কথা কিছুই বুঝতে পারল না। বলে উঠল যাই হোক স্কুল বন্ধ থাকবে তো কি হয়েছে ? আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুচকা পৌঁছে দিয়ে আসবো। ছেলেটি তখন আনন্দে বলে উঠল তাহলে তো বেশ হবে। পরদিন সকাল থেকে প্রচুর ফুচকা তৈরী করে। বিকেল বেলায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুচকা বিক্রি করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বাড়ি বাড়ি ফুচকার জন্য হাঁক দিয়ে বেরিয়েও কেউ এলো না। কিছুক্ষণ পরে পাড়া থেকে কতগুলো লোক বেরিয়ে এসে তাকে গালাগালি করতে শুরু করল। শাসিয়ে গেল এর পরের দিন থেকে এ পাড়ায় তাকে যেন আর না দেখে। না হলে তাকে পুলিশে দেবে। সে ভেবেই পেল না কেন তাকে পুলিশে দেবে, কেনই বা তাকে এভাবে অপমান করল! শোনার মধ্যে শুধু করোনা না কী একটা কথা শুনতে পেল। এদিকে বাড়িতে রান্নার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। বাড়িতে সে বলে এসেছে ফিরে আসার সময় চাল-ডাল কিনে নিয়ে যাবে। রাত্রে রান্না করে একসাথে খাবে। ফুচকাওয়ালা রামু শুধু সেই কথাগুলি ভাবে আর কাঁদে। গামছায় চোখ মুছতে মুছতে সে যখন বড়ো রাস্তা হয়ে বাড়ি যাচ্ছিল তখন রাস্তায় হঠাৎ পুলিশ গাড়ির সামনে পড়ল। গাড়ি থেকে পুলিশেরা নেমে তাকে লাঠি দিয়ে খুব মারল। রাস্তায় বেরোনোর অভিযোগে তাকে থানায় নিয়ে যাবে বলল। সে হাতে পায়ে পড়ল পুলিশের। অনেক কাকুতি-মিনতি করলে পুলিশেরা তাকে ছাড়ল বটে, কিন্তু তার গাড়ি থেকে ফুচকারাখার বাক্সটাকে রাস্তায় ফেলে দিল। পিচের রাস্তার উপর কাঁচের বাক্সটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর ফুচকাগুলি রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। পুলিশের লোকেরা বলল, আর যাতে কোনোদিন আমাদের চোখ এড়িয়ে রাস্তায় না বেরোতে পারিস সেই ব্যবস্থা করেছি। এই বলে তার গাড়িটা রাস্তার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। রামু রাস্তার ওপর কেঁদে কেঁদে গড়িয়ে পড়ল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলতে লাগল, হা ঈশ্বর, আমি তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করিনি। তাহলে আজ আমার সাথেই কেন এমন অবিচার হল, ভগবান! এইভাবে কিছুক্ষণ কাঁদার পর, পড়ে থাকা গাড়িটাকে টেনে তুলে বাড়ির দিকে চলল। রাস্তায় পড়ে রইল তার শ্রম, আশা-ভরসা। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতিদিনের মতোই বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্ত্রী ময়না চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে। স্বামীকে হঠাৎ বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখে একটু আনন্দের স্বরে বলে উঠল, আজ নিশ্চয় সব বিক্রি হয়ে গেছে ? বাজার এনেছ তো ? দেখ না খিদের জ্বালায় বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই হোক তুমি বসো। আমি বরং তোমায় একটু জল দিই। আর রান্নাটা সেরে নিই, বড্ড খিদে পেয়েছে।। এতোক্ষণ সে তার স্বামীর মুখের দিকে না তাকিয়েই এতো কথা বলছিল। হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েই সে তো অবাক। তার স্বামী বাচ্চাগুলোর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। রামুর চোখ থেকে জল তার বিবর্ণ গাল বেয়ে পড়ছে। এতক্ষণ সে যে কথা বলছিল কিছুই তার কানে ঢোকেনি। একটু মৃদু স্বরে ডাকতেই সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল। বলল, কি হয়েছে তোমার চোখে জল ? আজ কি বিক্রি হয়নি ? তারপর তার স্বামী তাকে সব ঘটনা খুলে বললে, সে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। বাচ্চারা হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে, ঘরে বাবাকে দেখে মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে বাবাকে আঁকড়ে ধরে বলল, এই তো বাবা এসেছে। বাবা জানো আমার খুব খিদে পেয়েছে। মাকে বলো না আমাদের কিছু খেতে দিতে। মেয়ের কথা শুনে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে

থাকে। ছোটো বাচ্চারা কিছুই বুঝতে পারে না। মেয়ে বলল, কি হয়েছে বাবা কাঁদছ কেন ? এই বলে মেয়ে তার বাবার চোখের জল মোছাতে লাগল। এদিকে মা বাড়িতে যেটুকু খাবার ছিল, তাই আধপেট খেয়ে সেদিনকার মত রাত্রি কাটল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার সময় ঘরে কোনো খাবার না পেয়ে কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। বাচ্চারা যখন খিদায় কাতর হয়ে মা মা করে খাবারের জন্য ছুটে আসত, কষ্টে তার মায়ের বুকটা কেঁপে উঠত। বাড়িতে কোনো খাবার না থাকায় বাচ্চারা না খেয়েই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাচ্চাদের দুঃখ আর দেখতে না পেরে মা ও বাবা ভিক্ষার আশ্রয় নিল। কিন্তু সংক্রমণের ভয়ে কেউই তাদের ভিক্ষাও দিত না। অবশেষে অসহায় বাবা তার স্ত্রীকে বলে উঠল, আমাদের গ্রাম প্রধান খুব ভালো মানুষ। তার কাছে কিছু থাকলে সে নিশ্চয় তাদের ফেরাবে না। এই আশা নিয়ে তারা বাচ্চাদের ঘরে রেখে, প্রধানের বাড়িতে গেল। কিন্তু সেখানেও তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসার সময় তারা শুধু ভগবানকে ডাকতে থাকে। ভগবান! এই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখাও। এদিকে বাড়িতে বাচ্চারা খাবারের জন্য অপেক্ষা করে আছে। বাড়িতে ফিরে বাচ্চাদের কোনো জবাব দিতে পারে না। অনাহারে দুঃখে কষ্টে বাচ্চারা দুর্বল হয়ে পড়ল। হঠাৎ একদিন রমার খুব জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে ভুলভাল বকছে। মাথায় জলপটি দিয়ে কোনো ফল হল না। পাশের বাড়ির লোকেরাও সংক্রমণের ভয়ে তাদের বাড়িতে এল না। এদিকে কোনো উপায় না দেখে অসহায় রামু ছুটল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারখানায় ডাক্তার না পেয়ে ডাক্তারের বাড়িতে ছুটল। কিন্তু ডাক্তারও সংক্রমণের ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না। রামু ডাক্তারবাবুর পায়ে হাতে ধরল, তাতেও কোনো ফল হল না। ডাক্তারবাবু তার ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। রামু কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল। এদিকে মেয়েটি জ্বরের ঘোরে জল জল বলতে লাগল। তারপর ছটপট করতে করতে হঠাৎ একবার নিঃশ্বাস ছেড়ে একেবারের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল। মা তা দেখে কাঁদতে কাঁদতে শোকে যেন পাথর হয়ে গেল। পাশে বসে থাকা ছোট ভাই কিছুই বুঝতে পারল না। এদিকে বাবা বাড়িতে ফিরে এল। মেয়েকে দেখে যেন একটু শান্তি পেল। কিছু না জেনে বলে উঠল, জ্বরটা বোধহয় একটু কমেছে। তাই শান্তিতে একটু ঘুমোচ্ছে। তারপর যেই মাথায় হাত বোলানোর জন্য গেল তখনই সবটা বুঝতে পেরে মেয়েকে ধরে কাঁদতে লাগল। মা হঠাৎ বলে উঠল এতক্ষণ পর ও একটু ঘুমিয়েছে দেখছো না ? চুপ, এখন কান্নাকাটি করো না। ওকে ঘুমোতে দাও। দেখছ না কী শান্তিতে ঘুমাচ্ছে ? শুনে বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল ও আর কোনোদিন ঘুম থেকে উঠবে না রে ময়না উঠবে না। ছোট ভাই কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফেলিয়ে বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা শুধু বলে ফিরে আয় মা, তুই ফিরে আয়।

নষ্টনীড়

আগমনী পণ্ডা
ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো আজ সকালে বড়ো কাকুর বারান্দায় পড়তে বসেছি। কানে এল ঘুঘু পাখির ডাক। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে দক্ষিণের জানালার দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম সামনের আতা গাছটার ফাঁকে দুটি ঘুঘু পাখি গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে সুন্দরভাবে পা ফেলে ফেলে নাচতে নাচতে ডাকছে ঘু-ঘু-ঘু। আমার পাখির ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে। আমি কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম ওই দুটি পাখির পায়ের ছন্দও দেখলাম। ওদের ডাক খুব সুন্দর। দেখতে দেখতে আরও লক্ষ্য করলাম আতা গাছের তিনটি ডালের ফাঁকে কিছু ঘাসের টুকরো জমানো আছে। বুঝতে আমার বাকি থাকলো না যে পাখি দুটি সংসার গড়ছে - নতুন সংসার, নতুন বাসা। ঠোঁটে করে ঘাস-পালা, ছোট কাঠি এনে তৈরী করছে ওদের স্বপ্নের বাড়ি – ওদের ডিম পাড়ার নতুন আস্তানা। আমি দূর থেকে নীরব দর্শক হয়ে দেখতে থাকলাম দিনের পর দিন। দেখছি, দেখছি আর দেখছি।

সপ্তাহ খানিক বাদে বাসাটার দিকে নজর পড়তে দেখি দুটি ডিম পেড়েছে ওরা। একটি পাখি তার নরম পালক দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে ওদের আদরের ডিমগুলোকে, তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কি ধৈর্য্য! কি সাধনা! যেন এক ধ্যানে এক মনে উত্তরসূরিদের আহ্বান জানাচ্ছে ওরা।

অল্প কিছুদিন বাদে দেখি ছোট্ট দুটি কচি তুলতুলে বাচ্চা। মা-বাবা দুজনে বাচ্চাদুটোকে খাওয়াতে ব্যস্ত। ধীরে ধীরে বাচ্চাগুলো বড়ো হচ্ছে আর ওরাও চিঁ চিঁ রবে ডাকতে শুরু করেছে। একদিন বিকালে দেখি আমাদের বাড়ির পোষা বিড়ালটি ওই আতা গাছের তলায় বসে ওদের দিকে তাকিয়ে ম্যাঁও ম্যাও করে ডাকছে। পাখিগুলি প্রচণ্ড চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক হচ্ছে। ওদের চঞ্চলতা দেখে আমি বুঝতে পারলাম বিড়ালটিকে ওরা ভয় পাচ্ছে, বিড়ালটিকে তাড়ালাম। ও চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখি আর এক সমস্যা। একটা কাক ওদের বাচ্চাগুলোকে খাবে বলে ছোঁ মারছে। কি ভীষণ বিপদ! আর পাখিগুলি জীবন বাজি রেখে ও কালরূপী কাকটার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আমার ছোট ভাই ঠিক সেই সময়ে কাকটির দিকে একটি ঢিল ছুঁড়ে। ব্যাস! কাকেরা উড়ে পালাল।

এতোদিনে পাখিগুলি, পাখিগুলির ছোট্ট সংসার আমাদের সকলের কাছে খুব খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি রাতে রক্ষা করবার জন্য বাইরে একটি ইলেকট্রিক বাল্বও এতোদিনে ঝোলানো হয়েছে।

বেশ সুখেই বাচ্চাগুলো বড়ো হচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম ওই বাচ্চাদের চিঁ চিঁ শব্দ। বেশ বুঝতে পারতাম বাচ্চাদের হয়তো তার মা ঠোঁটের উপর ঠোঁট দিয়ে খাওয়াচ্ছে। হঠাৎ একদিন দুপুরে আমরা যখন দিবা নিদ্রায় বিভোর, ঠিক সেই সময় ওদের সংসারে নেমে এল কালের করাল ছায়া। একটা কালো বড়ো ভয়ঙ্কর সাপ গাছের উপর উঠে বাচ্চাদুটোকে গিলে ফেলল। আমরা ওদের চিৎকার শুনে ছুটে বাইরে এলাম। এসে দেখি একটি পাখির রক্তাক্ত জখম দেহ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আর অন্য পাখিটি তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার ঠোঁট দিয়ে, পায়ের নখ দিয়ে সাপটাকে আক্রমণ করে চলেছে। আমরা লাঠি নিয়ে সকলে তেড়ে গেলাম। সাপটি চলে গেল। কিন্তু ধ্বংস করে গেলো একটি সুখের সংসার। তিন তিনটে জীবন ওর লোভ-লালসার শিকার হয়ে গেল। মনে কষ্ট পেলাম। মাটিতে বসে পড়লাম। আর মনে আসতে লাগল প্রথম দিনের ওদের দৃশ্য। কানে যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি ঘু-ঘু-ঘু। পাখিটি কিন্তু ডাল ছেড়ে গেল না বটে, কিন্তু সেদিন নীরব, তার চঞ্চলতা আমার চোখে পড়েনি। ওকি একা একা বসে বসে ভাবছে তার হারিয়ে যাওয়া সংসারটির কথা ? তার হারিয়ে যাওয়া আদরের, স্নেহের তিনটে তাজা জীবনের কথা না কি ভাবছে তার ভেঙেচুরে যাওয়া নষ্টনীড়টির কথা!

বাঁকুড়া জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়

অভিষেক মুসিব
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সাংস্কৃতিক পরিচয় ঃ ঐতিহ্যময় বাঁকুড়া জেলার মিশ্র সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পাই।একদিকে জঙ্গল, জলাধার, পাহাড়ি প্রকৃতির সাজে, শাল-মহুয়া মাদলের ছন্দে লোকায়ত মেলা ও উৎসবের মহিমায় প্রাচীন পুরাকীর্তির গৌরবে ও লোকসংস্কৃতির প্রাচুর্যে বাঁকুড়া জেলা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই জেলার বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে টেরাকোটার মন্দিরগুলি পৌরাণিক ও সামাজিক তথ্যের জীবন্ত দলিল। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে ভাস্কর্যগুলি খোদিত হয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকে যে সাংস্কৃতিক বিকাশ চরম উৎকর্ষ ধারণ করেছিল তার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বিকাশ। সাহিত্যের দিক থেকেও বাঁকুড়া জেলা পরিপুষ্ট। জগদ্রাম রায়, কবি শঙ্কর চক্রবর্তী, রামাই পণ্ডিত, মানিকরাম গাঙ্গুলি, হেমলতা দেবী, রাধাবল্লভ দাস, যদুনাথ দাস, মা সারদাদেবী, সত্যকিংকর সাহানা, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই জেলার উজ্জ্বল সন্তান। চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের দিক থেকেও বাঁকুড়া জেলা পিছিয়ে নেই। এই জেলার দুই কৃতি সন্তান যামিনী রায় ও রামকিংকর বেইজ। যামিনী রায়ের মাধ্যমে গ্রামীন শিল্পকলা অভিনব সৌন্দর্য সংকেত নিয়ে হাজির হয়েছিল। রামকিংকর বেইজ ছিলেন মূলত ভাস্কর্য শিল্পী। প্রাকৃতিক বৈচিত্র থেকে তাঁর ভাস্কর্যের মৌল উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায়, মাণিকলাল সিংহ, ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ সাহিত্য -সংস্কৃতি প্রেমী অনন্য ব্যক্তিত্ববৃন্দ এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাট্যকার ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এই জেলার সাহিত্য চর্যার পথকে অগ্রসর করেছেন।

ধ্রুপদ সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরে একটি নিজস্ব গায়কী পদ্ধতি উদ্ভুত হয়েছিল যা বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে পরিচিত। মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের আমলে এই ঘরানার উদ্ভব ঘটেছিল এবং সমগ্র বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে এর বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল। বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, যদুভট্ট প্রমুখ। বাঁকুড়া জেলায় ছোট ছোট রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল একাধিক সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র। বিষ্ণুপুর ঘরানাকে বাদ দিলে লোকসঙ্গীত এ জেলাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মধ্যযুগ থেকেই সাধারণ মানুষের মনে জনসঙ্গীতের একটি প্রবাহমান ধারা বজায় ছিল। মঙ্গলকাব্যের গান, পটচিত্রের গান, কথকতা, হাপুগান, ছড়া, ভাদু, টুসু, করম, কবিগানের মধ্য দিয়ে আজও বাঁকুড়ার লোক উৎসবগুলি পালিত হয়। লোকসঙ্গীতগুলির প্রধান বিষয়বস্তু সমসাময়িক জীবন ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ। বর্তমানে লোকসঙ্গীতের একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে বাউল গান। মেলা উৎসব অনুষ্ঠানগুলিতে সাধারণ মানুষের বিনোদনের জন্য বাউল গানের আসর বসে। বাঁকুড়া জেলায় ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতার অন্যতম চর্চাকেন্দ্র। গ্রামের সাধারণ ও অশিক্ষিত মানুষ আজও কথকতার মাধ্যমে সাহিত্যের পৌরানিক পাঠগুলির রসাস্বাদন করে। গ্রামবাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালাগান ও কীর্ত্তন পরিবেশিত হয়। কীর্ত্তনিয়ারা বিভিন্ন পৌরানিক কাহিনী যেমন কংসবধ, রাসলীলা, সীতাহরণ, মান, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, প্রভৃতি পালাগান কথকতা ও গানের সংমিশ্রণে খোল-কীর্ত্তনের দ্বারা পরিবেশন করেন শ্রোতাদের কাছে। গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অন্যতম আরেকটি দিক হল যাত্রা ও থিয়েটার। জেলার অনেক নাট্যকার অনুদিত নাটক ও মৌলিক নাটকের সংখ্যা থেকে বোঝা যায় এই জেলার নাট্য ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। নাটকের চেয়েও যাত্রাপালা এখানকার মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জয়কৃষ্ণপুর ও রাধানগরে দুটি যাত্রার দল ছিল। বাঁকুড়া শহরে যাত্রার প্রবর্তন হয়েছিল সম্ভবত উনিশ শতকের শেষার্ধে। গ্রামের অনুষ্ঠানগুলিতে দু'রকম যাত্রা পরিবেশিত হয় যথা সামাজিক ও পৌরানিক। কখনও কখনও রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ হত। যাত্রাপালাগুলি হয়ে থাকে কোনো

পূজোপার্বন বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। তিন-চার মাস আগে থেকে রাত্রিবেলায় গ্রামের আটচালা ও ক্লাবগুলিতে রিহার্সাল বা মহড়া দেওয়া হত। কোথাও কোথাও দেখা যায় গ্রামের পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে। যাত্রার ব্যায়ভার গ্রামের মানুষেরা বিশেষত যারা অভিনয় করে তারা নিজেরাই চাঁদা তুলে নির্বাহ করে। গ্রামগুলিতে যাত্রার দিনে শিশু থেকে বয়স্ক সবার মনে একপ্রকার উত্তেজনা ও উন্মাদন কাজ করে। যাত্রার মতো থিয়েটারের ঐতিহ্যও প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য্য পরিবারের থিয়েটার ছিল প্রাচীনতম। বাঁকুড়া শহরে প্রথম সংঘবদ্ধ থিয়েটারের দল ছিল ‘অরোরা’ গোষ্ঠী।

জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিচয় হল সাঁওতালী নাচ ও গান। সাঁওতাল জনজীবনের আনন্দক্ষেত্রটি নাচ ও গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সারাদিনের ক্লান্তির পর মহুয়ার নেশায় ধামসা মাদলের তালে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের গান পরিবেশিত হয় অপূর্ব ছন্দ নৃত্য ভঙ্গিমায়। তাদের জীবনে বসন্তের রঙিন দিনগুলিকে তারা পালন করে শালুই উৎসবের মধ্য দিয়ে। ভাটিয়ালি সুরে ঝুমুরের লালিতে গ্রাম বাংলার গানগুলি অপূর্ব ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সাঁওতাল ও তপশিল সমাজের বাড়িঘর ও আঙিনায় চিত্রিত লোকসমাজের নানান উপকরণ ও ছবিগুলি লোকসংস্কৃতির গৌরব। কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বন, নৃত্য-গীত, গৃহসজ্জা, সাধারন উৎসব অনুষ্ঠান জেলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অন্যদিকে জেলার নিম্নবর্গের প্রান্তীয় মানুষ ও আদিবাসী সমাজের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক দিক এই জেলায় কোথাও ভিন্নতা আকার নিয়েছে আবার কোথাও সংমিশ্রণের রূপ নিয়েছে। আদিবাসী সমাজের উৎসবের যেমন করম, সহরাই, বাঁধনা,বাহা জাতির সংস্কৃতিক ছন্দ আমাদের মনসা, কালী, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি পুজোগুলিতে স্পন্দিত হয়। বাউল, রামায়ণ, ভাদু, টুসু, ঝুমুর নানা গানের ছন্দ সারা বছর ধরে মানুষের মনে গুঞ্জরিত হয়।

বাঁকুড়ার প্রধান পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যথা শুশুনিয়া, মুকুটমনিপুর, বিষ্ণপুর, জয়রামবাটী, বিহারীনাথ প্রভৃতি জায়গায় সারাবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের সমাগম হয়। বিভিন্ন জেলার বাইরে থেকে বিভিন্ন মানুষের আগমনে সাংস্কৃতিক বিকাশের অগ্রগতি ঘটেছে।

একটি গাছের আত্মকথা

সৌমি দত্ত

বি.এ. জেনারেল, দ্বিতীয় বর্ষ

আমি এক প্রাচীন বটগাছ। বহু বছর ধরে শ্রীবল্লভপুর গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। দেখেছি কত মানুষের হাসি-কান্নায় মাখা মুখ। গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই আমার ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা আমার ডালে দোল খায়, কেউ বা নিজের নাম খোদাই করে যায়। আমি তাদের বাল্যবন্ধু ও নিঃশব্দ আশ্রয়।

আমি দেখেছি প্রজন্ম বদলাতে। যে মেয়েটি আমার তলায় বসে রান্নাবাটি খেলত, সে আজ বৃদ্ধা হয়েছে। যে ছেলেটি আমার ছায়ায় লুকাত, সে এখন নাতি নাতনির হাত ধরে আজও আমার কাছে আসে। আমার দেহে সময়ের চিহ্ন আছে। শুকনো ডাল, ফাটল ধরা বাকল। তবুও আমি আজও অটল রয়েছি, তাদের জীবনের স্মৃতি হয়ে।

কিন্তু এখন আমার মন কষ্টে ভরা। মানুষ আমাকে আর আগের মতো ভালো বাসে না। আমার কান্না কেউ শোনে না। আমার ডাল কেটে নিয়ে যায়। কখনো শিকড় সমেত কাটতে উদ্ধত হয়। আমার মনে খুব ভয় জাগে, হয়তো সত্যিই একদিন আমাকে কেটে ফেলা হবে। আর আমার জায়গায় দাঁড়াবে কংক্রিটের দেওয়াল।

তবুও আমি আজও আশা ছাড়িনি। এখনো কিছু শিশু আমার সাথে খেলে, পথের পথিকেরা রোদ-বৃষ্টিতে আমার তলায় বসে শান্তি খুঁজে পায়। আমি বিশ্বাস করি, একদিন মানুষ আবার বুঝবে - আমি শুধু কাঠ

নই, আমি জীবনের অংশ – আমিই হলাম প্রকৃতির হৃদস্পন্দন।

হ্যাঁ আমি গাছ। আমি কথা বলি না, কিন্তু সবই দেখি, সবই বুঝি। আমার নিঃশব্দ দেহে সুপ্ত রয়েছে সময়ের ইতিহাস, মানুষের ভুল আর ভালোবাসার সাক্ষী।

আমি বেঁচে আছি আজ এই বিশ্বাসে –

যতদিন মানুষের হৃদয়ে সবুজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে / ততদিন আমিও থাকবো জীবনের সঙ্গী হয়ে।

দুর্নীতি

সুব্রত গোস্বামী
শিক্ষাকর্মী

দুর্নীতি শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশী সকলেই পরিচতি। ছাত্রভর্তি থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভর্তি, শিক্ষকতার চাকরী থেকে পিয়ন পদে নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির প্রসার যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। আর দুর্নীতি শব্দটির সঙ্গে আমাদের ব্যাপক পরিচিতির ফলে যখন এই দুর্নীতি আমাদের সমাজ জীবনকে ব্যাপকভাবে কলুষিত করে তখন আমাদের কাছে এটা যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমরা এই দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে ভুলেই গেছি। ফলে এই অসুখটি সমাজ জীবনে 'ক্যান্সার'-এর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার দেখলাম ২০১৬ সালের টেট -এর শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে। যার ফলশ্রুতিতে দেখলাম স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন। আবার আমাদের পাশের রাজ্য বিহারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 'পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি' মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে গিয়েছেন। এর চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ঝাড়খন্ডী সাংসদ কেনাবেচার মামলায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। 'দুর্নীতি' শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো – দূর (নিন্দিত) যে নীতি, কু-নীতি, কু-রীতি, অ-সদাচার, অ-সদাচারী, দুরাত্মা, দুর্বৃত্ত (অভিধান – জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস)। দুর্নীতি পরায়ণ মানে অসদাচারী। যিনি সদাচার পালন করেন না, তিনিই দুর্নীতিপরায়ণ। আবার এই 'দুর্নীতি' শব্দের আরেকটি মানে হলো নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা, ভুল করা। তাহলে এমন কোনো মানুষ কি আছে যে, সে কখনো ভুল করেনি ?

মানুষ মাত্রই ভুল করে এবং অবশ্যই তার সংশোধন আছে। একমাত্র ঈশ্বরের ভুল হয় না। তিনিই নির্ভুল। ভুল করাও এক ধরণের দুর্নীতি। কারণ এই ভুলের জন্য আমাদের জীবনও চলে যেতে পারে। দুর্নীতির পেছনে থাকে লোভ। লোভই মানুষকে দুর্নীতির পথে চলতে বাধ্য করে। আবার রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। রাষ্ট্রের কাজ হল 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'। – তার পরিবর্তে রাষ্ট্র যদি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে – তা হলে তার দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হয় না। তখনই মানুষ 'দুর্নীতি' আশ্রয় নেয়, এবং নিজের আশা আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করে। সমাজ জীবনে মানুষ কখনও কখনও 'দুর্নীতির' আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তা যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই তা সর্বনাশের কারণ হয়। তবে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতিকে একেবারে উপড়ে ফেলা যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বিধাতার অশেষ করুণায় যদি মানুষের বোধবুদ্ধির উদয় হয় এবং 'দুর্নীতির' বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করে তবে আশা করা যায় 'দুর্নীতি'কে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে।

বাবা

পার্থ অধিকারী
শিক্ষাকর্মী

ছেলে কিংবা মেয়ে জন্মাবার পর সব দায়িত্ব মা সামলান ..... কিন্তু একবারও মনে হয় না, সারাদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে এসে অবসন্ন একলা মনে চেয়ে থাকে তার বাচ্চার দিকে, মা বলে তুমি বাচ্চাকে ভালোবাসো না, আদর করো না। তখন তার বাবা দু'হাত তুলে বাচ্চাকে আদর করতে থাকে। কোথাও না কোথাও বাবার জ্বল জ্বল করতে থাকা চোখ দুটিতে তার আত্মজর ছবি আঁকে। তার মনে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি'। বাবার ভালোবাসাই এইরকম। কাউকে জানতে না দিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য রাখা এবং সবরকম সহযোগিতা করা। এইরকম নিরলস কঠিন পদার্থের নামই মনে হয় ... বাবা!!!!

We are Gen-Z

Aksha Afrin
1st Semester, English Major

Hey, you know. Why do they call us Gen-Z.? My friend on her way to Psychology class, was listening to the professor, calling the group of brat boys and girls, sitting in front, Gen-Z. We both tiptoed close to the classroom and listened in what he was lecturing on. "You guys cold hearted, arrogant, emotionless... Gen-Z". As if, he was pounding on the onlooking students. We further in, got our ears flattened to listen to him. He, being a bit soften down, "You people, are born between 1997 and 2012, grew up with internet, smart phone, social media, climate change, COVID crisis. You guys spend more time online than your previous generations. You have shorter attention but are all multitasking because of frequent digital interactions. Surveys report that Gen-Z have mental health crisis, full of worries, having trust issues. Pandemic isolation, rising rates of depression, what not you guys have been with these for decades." The professor sometimes blurts out at the front row pupils. "Emotional well being not at all nurtured, falling prey to suicide, break ups, divorces, violent protests etc. They don't want to engage to any relationship, having an isolated life, with no such goals in the mind to pursue. Numbness grips over them." We are lost in the professor's lectures on the Gen-Z. Already getting late for the next class, my friend and I, walked away. I was wondering if it is natural for these group of boys and girls of my age or whom to blame for this. Are we really Gen-Z? Hey what are you thinking? Are we? She nods her head. Months ago, I came across a book *Gen-Z Parenting* at a book stall at Delhi airport on my way back to Kolkata. It was since then my mind was stuck with the Gen-Z.

কলম

শিবনাথ সিং
ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

কথায় আছে কলম তলোয়ারের চেয়েও শক্তিশালী। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের মাধ্যম হল কলম। সেই আদিম যুগ থেকে মানুষের সভ্যতার উন্মেষের আত্মপ্রকাশে কলমের ভূমিকা চিরন্তন। তৎকালীন মানবজীবনে কলম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কলম আমাদের জীবন ও জীবিকার নির্বাহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে কলমের ব্যবহার করে থাকি। এই কলমের প্রচলন একদিনে শুরু হয়নি। এর পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। ইংরেজিতে ‘পেন’ শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘Penna’ থেকে। এই ‘Penna’ শব্দের অর্থ হল ‘পাখির পালক’। সম্ভবত মিশরীয়রাই প্রথম কাঠের ডগায় তামার পিপের মতো কিছু একটা মুড়িয়ে লেখা শুরু করেছিল। তবে তারা গাছের ছাল বা পাতার উপর লিখত। এরপর আনুমানিক চার হাজার বছর পূর্বে গ্রীকরা লেখা শুরু করেছিল। এরা কলম তৈরী করত হাতির দাঁত বা এই জাতীয় জিনিস দিয়ে। যার নাম ছিল স্টাইলস্। সেই কারণেই এখনও আমরা লেখার ধরণকে স্টাইল বলে থাকি। এরপর মধ্য যুগে কাগজের আবিষ্কার হলে পাখির পালকের তৈরী কলম দিয়ে লেখা শুরু হয়।

এই পাখির পালকের ইংরেজী নাম ‘Quill’। সাধারণত ‘Quill’ বলতে কোনো রাজহাঁস বা বড় কোনো পাখির পালকের তৈরী কলমকে বোঝাত। ১৭৮৭ সালে এই ‘Quill’ পেন দিয়েই আমেরিকার সংবিধান লেখা হয়েছিল। তবে এগুলি এখন আর ব্যবহার করা হয় না। বহু সময় ধরে নলখাগড়া বা খাগের কলমের ব্যবহারের পর পাখির পালকের তৈরী কলম ‘Quill’ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর ১৭৮০ সালে ইংল্যান্ডের বাসিন্দা জন মিচেল আধুনিক পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে স্টীলের নিব্ পরানো একটি কলমের আবিষ্কার করেন। এরপরে ঊনবিংশ শতকে কলমের জগতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়। ১৮৮৪ সালে এক আমেরিকান লুইস ওয়াটারম্যান একটি ফাউন্টেন কলম আবিষ্কার করেন। Steel এর নিব তৈরীতে ব্যবহার করা হতো ১৪ ক্যারেট সোনা। এরপর ধীরে ধীরে আরও অনেক দেশে ফাউন্টেন কলম তৈরী করা শুরু হয় এবং ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে বাজারে আসতে শুরু করে দেয় এই কলম। কবিগুরু এই ফাউন্টেন কলমের নাম রেখেছিলেন ঝর্ণা কলম। বর্তমানে আমরা যে কলম ব্যবহার করি সেই ডট কলম বা বলপেন কে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে একটু মতবিরোধ রয়েছে। বর্তমানে পাখির পালকের তৈরী কলম স্থান পেয়েছে জাদুঘরে। যুগের সাথে কলমের ধরণ বদলেছে। এখন এটা দেখার যে, আধুনিক কলমের ভবিষ্যৎ কী ? তাতে কি আদৌ আধুনিকতার স্পর্শ লাগবে ? নাকি আধুনিক কলমও একদিন স্থান পাবে জাদুঘরে ?

স্বাধীনতার একটা দিক

গোপাল প্রধান (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ) ও প্রসেনজিৎ ভূঞ্যা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) তৃতীয় সেমি

আমরা ভারতবাসী ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা পাই ব্রিটিশ শক্তি থেকে। প্রকৃত স্বাধীনভাবে ভারতের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারির পর থেকেই। কিন্তু স্বাধীনতা যা পেয়েছি তা কি ধরণের, কিভাবে ব্যবহার করব তা জানা হয়নি আজ অবধি বোধহয়।

সাধারণত স্বাধীনতার অর্থ আমরা জানি যে স্বাধীনতা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে মুক্তভাবে

অবস্থান করে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন ক্ষেত্রগত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারি।

কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক অবস্থানের কারণে এই মুক্তভাবের অবস্থানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিকাশটা সকলের জন্য প্রাপ্য। আর যখনই স্বাধীনতাকে সকলের প্রাপ্যের জন্য করে দেওয়া হচ্ছে তখনই স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আসছে। আর এই সীমাবদ্ধতা বাঞ্ছনীয় প্রয়োজনীয় এ ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ করা কঠিন হয়ে যাবে স্বাধীনতা আমাদের থেকে দূরে চলে যাবে, দুর্বলের উপর সবলের শাসন কায়েম হবে। কিন্তু আমরা যে অর্থ স্বাধীনতা ভোগ করছি তা অবাধ বিশৃঙ্খলা যা সমাজের কোন স্তরের পরাধীনতা নিয়ে আসছে। আমরা রাস্তা দিয়ে মেয়েরা হেঁটে গেলে খারাপ মন্তব্য করছি, আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গীতরত শিক্ষককে অসম্মান করছি, আমরা জোরে বাইক বাড়ি চালিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছি। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খারাপ নির্মাণ কাজের ফলে শত শত মানুষের জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছি, আমরা জোরে মাইক চালিয়ে শব্দ দূষণ করছি, বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ করছি। রাজনৈতিক ব্যক্তি হয়ে প্রতিশ্রুতির দ্বারা মানুষকে শোষণ করছি। মানুষের জিনিসপত্র চুরি ডাকাতি করছি ..... ইত্যাদি।

পূর্বে বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল এবং এখন অভ্যন্তরীণ মানুষের অবাধ স্বাধীনতা মানুষকে পরাধীন করে রেখেছে যার ফলে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক অসংগতি অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং বেড়ে চলেছে। একটি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। তেমনি একটি সভ্য সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য কিন্তু এই স্বাধীনতার কোথায় কতটা সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন তা বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

২০২৫ বর্ষে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালনীয় তো হল যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছি। তাহলে আমরা সমাজবদ্ধ পারস্পরিক নির্ভরশীল জীব হিসেবে সন্ধান করব প্রকৃত স্বাধীনতার এবং প্রকৃত স্বাধীনতা দিবসের।

নিজস্ব একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা

পদ্মভূষণ ভূঞ্যা
এম.এম.এল.টি., তৃতীয় সেমিস্টার

তারিখটা ২রা মার্চ ২০২৩। আমি তখন মেদিনীপুরে বি.এম.এল.টি. পড়ছি। বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গনগনি ও মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর ঘুরতে গিয়েছিলাম। বিষ্ণুপুর থেকে আরণ্যক এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরছিলাম। মেদিনীপুরে নেমে হালকা খাওয়া-দাওয়া করে পরবর্তী দীঘা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছি। আমি ও আমার বন্ধু দু'জনেই পাঁশকুড়া যাবো। তারপর আমি সাইকেলে ও সে বাসে বাড়ি যাবে। আর একটা ব্যাপার হল যে, ওই ট্রেন থেকে নামার পর ওটাই তার শেষ বাস তারপর আর নেই।

যথারীতি আমরা ট্রেনে উঠে পড়লাম। কিন্তু হুঁশ ফিরল পাঁশকুড়া এসে। জানালার ফাঁক দিয়ে বুঝতে পারি যে এটা পাঁশকুড়া স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ট্রেন দাঁড়ানো তো দূরের কথা ট্রেন চলছে ঝড়ের গতিতে। তারপর Where is my Train অ্যাপে দেখলাম দীঘা এক্সপ্রেস তখন খড়্গপুরে আর আমরা পাঁশকুড়াতে। দরজার কাছে এসে দেখি ট্রেন মেচেদায় ঢুকছে। এবার সন্দেহ দানা বাঁধল, ট্রেন যাওয়ার কথা পাঁশকুড়া থেকে দীঘা লাইনে কিন্তু এটা যাচ্ছে হাওড়ার দিকে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাশের ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতেই বুঝতে পারলাম এটা দীঘা এক্সপ্রেস নয়। এটা রূপসীবাংলা এক্সপ্রেস। যেটা মেদিনীপুরে অনেকটাই দেরিতে ঢুকেছে আর দীঘা এক্সপ্রেসের সময়ে, যার ফলে আমরা ভুল করে এটাতে উঠে পড়েছি। আর দুঃখের বিষয় এটা খড়্গপুরের পর একদম সাঁতরাগাছিতে গিয়ে থামে।

এইবার চিন্তাটা আরও বেড়ে গেল কারণ বাসে বা ট্রেনে পাঁশকুড়া আসা গেলেও আর বন্ধুর বাড়ি

যাওয়ার বাস নেই। এটাও মেনে নিয়েছিলাম, তখন ভাবলাম ওখান থেকে আবার মেদিনীপুরে যে যার মেসে ফিরে যাবো। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা হেতু দেখলাম যে, এই ট্রেন যে সময়ে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে সে সময়ে আর কোনো মেদিনীপুরে যাওয়ার ট্রেন নেই। যা আছে তা ওই খড়্গপুর পর্যন্ত। একরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ট্রেনটা রূপনারায়ণ নদের ওপর কোলাঘাট ব্রিজ পেরিয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে সিগন্যালে আটকে যায়। আর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা দুই বন্ধু লাফ দিয়ে মাঝ রাস্তায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে নেমে যাই।

এইবার ভাবনাটা আরও বেড়ে গেল। দুইজনের মোবাইলের চার্জ প্রায় শেষের মুখে। চারিদিকে শুধু বনজঙ্গল। যাওয়ার কোনোদিকে রাস্তা নেই। চারপাশটা অন্ধকার আর বহুদূরে হাইওয়েতে গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। আর সাইডে খাড়াই ঢাল, পা পিছলে গেলেই সোজা খাতে পড়ব। বেশ অনেকটাই গভীর আর কচুরিপানাতে ভর্তি। দুপাশেই স্টেশন প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আর রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম।

তারপর মোবাইলের আলো জ্বেলে মিনিট দশের হাঁটার পর বনের মাঝে একটা সরু রাস্তা পেলাম। নেমে গিয়ে দেখি সেই জলাভূমিগুলোর মাঝে একটা সংকীর্ণ বাঁধ, সেটা পেরিয়ে আমরা লোকালয়ের মধ্যে ঢুকলাম। বাইরে কোনো লোকজন নেই। পাড়ার পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করায় আমাদেরকে চোর-ডাকাত ভাবতে পারে, এই ভয়ে কারোর বাড়িতেও জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি। অনেকক্ষণ পর একজনকে দেখতে পেলাম, মদ্যপান করে বাড়ি ফিরছেন। তাকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করে সামনে এগিয়ে গেলাম। পরিশেষে হাইওয়েতে পৌঁছালাম।

তারপর আমরা গুগুল ম্যাপে দেখলাম ওখান থেকে কোলাঘাট দেড়ঘন্টার হাঁটা পথ। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় বাস, অটো, টোটো কিছুই ছিল না। অগত্যা অবসন্ন পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রায় আধ ঘন্টা পর একটা মাল বোঝাই ছোট ট্রাক যাচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে ড্রাইভার কাকুকে অনুরোধ করে লিফট্ পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ওখান থেকে আবার ত্রিশ মিনিট হাঁটলে স্টেশন, তাই আর যাওয়ার ইচ্ছা হল না কারণ পাঁশকুড়াতে নেমে আর বাস পাওয়া যাবে না। তাই ওখান থেকেই রাধামণি বাস ধরার জন্য দশ মিনিট হেঁটে স্ট্যান্ডে গেলাম আর প্রায় কুড়ি মিনিট পর বাস ধরলাম। তারপর আমি মেচেদাতে নেমে ট্রেন ধরে বাড়ি এলার আর সে রাধামণিতে নেমে বাইকে করে বাড়ি পৌঁছালো।

রাসায়নিকের প্রভাবে মৃত্তিকার অবক্ষয়

মিতালী রাউল
বি.এম.এল.টি, তৃতীয় সেমিস্টার

বর্তমান পৃথিবীতে মাটি দূষণ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমাদের সুস্থ পরিবেশকে অসুস্থ করে তুলছে। বিভিন্ন উপায়েই মাটির দূষণ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত তবে প্রধান কয়েকটি কারণ হল অত্যাধিক প্লাস্টিক, শিল্পক্ষেত্রের তৈলাক্ত পদার্থ এবং কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক কীটনাশক ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থ ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা, জল ও বায়ু ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। মাটিতে বসবাস করা অনুজীব, ব্যাক্টেরিয়া ও পতঙ্গ মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ফলে এদের পরিমান হ্রাস পেয়ে চলেছে।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রধান কয়েকটি কীটনাশক হল DDT, Beetles, Agaricus, Carbamate, Capybera, Sodium arsenite, Sodium Chlorate ইত্যাদি। এছাড়াও মাটি দূষণ নানান প্রাকৃতিক কারণেও ঘটছে। তবে সবচেয়ে বেশী মাটি দূষণ ঘটেছে মানুষের লাগাম ছাড়া রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে। মানুষেরা অতিরিক্ত ফসলের আশায় প্রচুর রাসায়নিক ব্যাবাহারের ফলে মাটির নিজস্ব গুনমান হ্রাস পাচ্ছে। সাথে সাথে এই কীটনাশক ব্যবহৃত ফসল খাওয়ার ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগ বেড়েই চলেছে। যেমন

হৃৎপিন্ডের সমস্যা, ত্বকের সমস্যা, চোখের সমস্যা, শ্বাসকষ্টের সমস্যা ইত্যাদি।

তাই পরিবেশ তথা মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ সমস্ত কিছুকেই বাঁচাতে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত - রাসায়নিকের চিহ্নিতকরণ। যে সমস্ত রায়ায়নিক মাটির উপর চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এবং মানুষের স্বাস্থের ওপর প্রভাব ফেলছে। শুধু চিহ্নতকরণ করলেই হবে না, এর সাথে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং বোঝাতে হবে রাসায়নিক ক্ষতিকর প্রভাব পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর।

'মাটি আমাদের মা' এই কথাটা সত্য মেনে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং মাটিতে কীটনাশক-এর পরিবর্তে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ মাটি হল সম্পদ যা আমাদের বাসস্থান , খাদ্যের উৎস এবং জীবকূলের প্রধান রক্ষক। মাটি শুধু মানুষের না সমস্ত জীবকূলের, তাই আমাদের উচিত মাটিকে যত্ন নেওয়া ও পরিচর্যা করা এবং মাটির গুরুত্ব কতটা তা সাধারণ মানুষকে বোঝানো।

শিক্ষা

পরমানন্দ আচার
বি.এম.এল.টি., তৃতীয় সেমিস্টার

আমাদের জীবনে শিক্ষা হল এমন এক অবলম্বন যার মাধ্যমে আমরা নিজের ব্যক্তিত্বের শোধন এবং সঠিক পথ নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

শিক্ষা একটা অনুভূতি যা যে কোনো কিছু থেকেই তা অর্জন করা যায় বলে আমার ধারণা। শিক্ষা হল সেই অভিজ্ঞতা যা জীবনের কঠিন সময়ে উত্তীর্ণ করে আমাদের সমস্যার হাত থেকে। শিক্ষা বয়স সময় ব্যক্তি বস্তু ধর্ম ছোটো বড়ো কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ জীবনে সঠিক পথ নির্বাচন ও সঠিক পথে চলার জন্য তুমি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস শিখবে তাই তোমার শিক্ষা ও যার মাধ্যমে শিখবে সেই তোমার শিক্ষক।

অন্যের কথা জানি না কিন্তু আমার জীবনে আমার দৃষ্টিতে আমি যাদের কাছ থেকে যা শিখেছি তারাই আমার শিক্ষক। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমি অনুপ্রাণিত ও প্রেরিত আমার বাড়ির লোকেদের কাজকর্মের মাধ্যমে গৃহীত শিক্ষা থেকে যেমন —

(ক) আমার দাদু রোজ খবরের কাগজ পড়েন। তাঁর কাছ থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করি কীভাবে একাগ্রতার সাথে কোনো কাজ করতে হয় এবং শিখি কীভাবে নিজের মধ্যে নতুন কিছু শেখার ও জানার আগ্রহ বজায় রাখতে হয়।

(খ) ঠাকুমার প্রত্যেক কাজে খুঁত ধরার প্রবণতা থেকে শিখি কীভাবে নিজের করা প্রত্যেক কাজ নিখুঁত করতে হয় এবং নিজের ভুলত্রুটি নিজেই খুঁজে বের করব।

(গ) বাবার কাছ থেকে শিখি কীভাবে সবার প্রয়োজন ও চাহিদা মিটিয়ে সবাইকে ভালো রাখা যায়।

(ঘ) মায়ের কাছ থেকে শিখি কীভাবে সবার যত্ন করতে হয় এবং সংসারের সব খরচের মাঝে কীভাবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সঞ্চয় করতে হয়।

(ঙ) দিদিদের কাছ থেকে শিখি নিজের জিনিসগুলো কীভাবে ভাই-বোনেদের সাথে ভাগ করে মিলেমিশে থাকা যায়।

(চ) ছোট ছোট বোনেদের কাছ থেকে শিখি জীবনের জটিলতায় মাথা না ঘামিয়ে ছোট ছোট জিনিসে পেয়ে খুশি হয়ে জীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায়।

এছাড়া আমার মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় এর শিক্ষক ও আমার গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে আমি শিখেছি কীভাবে তার সকল ছাত্রছাত্রীদের নিজের সন্তানের মতো সমানভাবে কোনো বিভেদ ছাড়া সু-শিক্ষা প্রদান করেন ও সঠিক পথে চলতে পরামর্শ প্রদান করেন।

এরপরেও আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক হল সময় যা আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন।

কলেজের প্রথম দিন

সংযুক্তা সিং
দর্শন, প্রথম সেমিস্টার

সকালে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই মনে হচ্ছিল আজ যেন জীবনের এক নতুন চ্যাপ্টার শুরু হচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলাম – হালকা নার্ভাসনেস চোখে-মুখে স্পষ্ট।

তাড়াতাড়ি পছন্দের জামা পরে, ব্যাগ নিয়ে। বাড়ির বড়োদের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার প্রথম চলার সাথী মায়ের সাথে। প্রথম দিন মা গিয়ে ছিল আমায় পৌঁছে দিতে। আয়নায় শেষবার নিজের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আজ যেন আমি কোনো এক সিনেমার হিরোইন। এরপর বাসের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে পৌঁছে গেলাম কলেজ। কলেজ গেটে ঢোকার সাথে সাথেই ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিলো। সামনে অনেক অচেনা মুখ, কেউ কেউ একে অপরকে খুঁজে পেয়ে হেসে ফেলছে, কেউ আবার একা একা দাঁড়িয়ে নার্ভাস, আমি ছিলাম প্রথম ক্যাটাগরিতে। যেহেতু আমার স্কুলের অধিকাংশ সহপাটি আমার কলেজ ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় এখানেই ভর্তি হয়েছে এটা জেনে মনের মধ্যে একটু সাহস পাচ্ছিলাম। প্রথম লেকচারে ঢোকার আগে মনে হচ্ছিল যেন আমার হার্টবিটটা সবাই শুনতে পাচ্ছে। স্যার আসতেই সবাই চুপচাপ। লেকচারের অর্ধেকটা কেটে গেল নিজের নার্ভাস কন্ট্রোল কন্ট্রোল করতে করতে। তবে একটা মজার বিষয় হলো প্রথম ক্লাসে যে স্যার ছিলেন পরিচয় হওয়ার পর জানতে পারলাম স্যারের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই। শুনে ভালো লাগল। তারপর ক্লাসের শেষে আমি আমার দুজন সহপাটির সাথে পরিচয় করলাম। যদিও আমার একা থাকা পছন্দ নয়। তারপর তাদের সাথেই রওনা দিলাম ক্যান্টিনে। তারপর ক্যান্টিনে চাউমিন খেতে খেতে বাকি পরিচয় সেরে ফেললাম, যদিও মনের মধ্যে সংকোচ নিয়েই তাদের সাথে কথা বলছিলাম কারণ প্রথম দিনের পরিচয় কী বলবো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তারপর আমার প্রত্যেক বারের মতোই অভ্যাস যেহেতু আজ কলেজের প্রথম দিন তাই সবাই মিলে বসে একটু ছবি তুললাম। এভাবেই প্রথম দিনের প্রথম বন্ধুত্ব করলাম।

ক্যান্টিন থেকে বেরোনোর পথে আরেকটি বিষয় চোখে পড়ল আমার কিছুজন দাদা-দিদি কলেজের ভিডিও ব্লগ করছে। তারপর ও সিনিয়ার দাদা দিদিরা আমাদের সাথে একটু বললো, পরিচয় হলো, খুব ভালো লাগল। দিনের শেষে যখন কলেজ গেট দিয়ে বের হচ্ছিলাম, তখন আর সকালের মতো নার্ভাস লাগছিল না, মনে হচ্ছিল - এই জায়গাটা আমার নিজের হয়ে গেছে। এখানেই আমি হাঁসবো, কাঁদবো, ঝগড়া করবো আর গল্প তৈরী করবো – সেগুলো একদিন মনে করে হাসবো।

বেকারত্ব

পুতুল পাঁজা
এম.এ. বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন আমার / পকেট কেবল ফাঁকা
বাস্তবতার নিকট আমি / অচল গাড়ির চাকা

বেকারত্ব প্রতিটি জাতির জন্য অভিশাপ। কারণ মানুষের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও টাকার অভাবে তাদের মেধা হারিয়ে ফেলছে। আবার কেউ কেউ নিজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেকারত্বে ভুগছে। করোনা সংক্রমণের পর থেকে বেকারত্বের সংখ্যা প্রচুর পরিমানে বেড়ে গেছে। করোনা ভাইরাস আসার পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছে। অনলাইন ক্লাস, মোবাইল ফোনের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করার চাহিদাকে কমিয়ে দিয়েছে। যার ফলে তারা অনেক ডিগ্রি অর্জন করলেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। করোনা পরিস্থিতির আগে বেকারত্বের হার অনেক কম ছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণের পর বেকারত্বের হার অনেক বেড়ে যায়। আবার কিছু শিক্ষার্থী তাদের মেধা থাকা সত্ত্বেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। এখন সরকারী চাকরি নেই বললেই চলে। কিন্তু এইভাবে থাকলে চলবে না। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সরকারী চাকরি বাদেও আরও অনেক ধরণের কাজ রয়েছে। তাই কোনো কাজকে ছোট না ভেবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ছাদবাগান

সহেলি সামন্ত
ইংরেজি বিভাগ, অনার্স, প্রথম সেমিস্টার

বর্তমান সময়ে ছাদবাগান হল একটি সখ। গ্রাম থেকে শুরু করে বিশেষত শহর এলাকায় এর প্রভাব সব থেকে বেশি। জমির অভাবে বাড়ির ছাদের ওপর ছোট ছোট টব বা বাতিল হওয়া বালতি, ড্রাম প্রভৃতিতে মাটি ও জৈব সার দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফুল, ফল ও সব্জির গাছ লাগিয়ে যে বাগান তৈরী করা হয় তাকেই বলা হয় ছাদবাগান। এদিকে অতিরিক্ত নগরায়নের ফলে শহরজীবন থেকে গাছ ও গাছের সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে এবং ঠিক একই রকমভাবে গ্রামগুলিও আস্তে আস্তে শহরে পরিণত হচ্ছে তেমনই অন্যদিকে এই পদ্ধতির সাহায্যে সবুজের বিস্তার ঘটছে। এই ছাদবাগানে সাধারণত কম শাখাপ্রশাখাযুক্ত গাছ লাগানো হয় বিশেষত কাটিং চারা গাছ লাগানো হয়ে থাকে। শহর জীবনের ব্যস্ততা থেকে মানব মনকে কিছুক্ষণের জন্য অনেক খারাপ লাগাকে এক মুহূর্তে ভালো লাগাই পরিণত করে এই ছাদবাগান। এই ছাদবাগানে কোনো রকমরে রাসায়নিক সার না ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের জৈব সার ব্যবহার করা হয় বিশেষত গোবর শুকনো, কলার খোসা, শাকসব্জির খোসা, শুকনো পাতা, পেঁয়াজ খোলা ভেজানো জল, ডিমের খোলা ইত্যাদি। এই ছাদ বাগানের এক বিশেষ ফল গাছ হল ড্রাগন। ড্রাগন ফল গাছ এক বিশেষ প্রকার ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। যা ছাড়া এই ছাদবাগান অসম্পূর্ণ। প্রতিটি বাড়ির ছাদ বাগানে এই ফলের গাছটি অবশ্যই রয়েছে। এছাড়াও কাটিং করা আম গাছ, লেবু গাছ, পেয়ারা গাছ, কুল গাছ ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে। কেবলমাত্র ফল গাছ নয়, বিভিন্ন ধরণের ফুল গাছও লাগানো হয়ে থাকে। যেমন গোলাপ, টগর, ডালিয়া, পিটুনিয়া, পদ্ম ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন শাক-সব্জি যেমন-বেগুন, লঙ্কা, কলমিশাক, পুঁই গাছ, কুমড়ো গাছ ইত্যাদি। বর্তমানে এই ছাদবাগান ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আশাকরি এইভাবে ভবিষ্যতে ছাদবাগানের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে সবুজের বিস্তার ঘটবে।

বিজ্ঞানের বিশ্বমঞ্চে ভারতবর্ষ

আত্মদীপ ভট্টাচার্য
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

বহুবছর ধরে বিদেশী শাসক দ্বারা আক্রমণ ও ব্রিটিশ রাজের শোষণ ও নিপীড়নের জর্জরিত হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষ, কিন্তু তাতেও পিছিয়ে থাকেনি আমাদের দেশ। দেশমাতৃকার থেকে জন্ম নেওয়া অসংখ্য রত্ন এগিয়ে নিয়ে গেছে ভারতের মান, মর্যাদা ও বিজ্ঞানকে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তারা অবদান রেখেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, অস্ত্র বিজ্ঞান প্রভৃতিতে এবং যা বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব দ্বারা সমাদৃত ও এখনো অব্যাহত।

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে বর্তমান কম্পিউটারের যুগে 'বাইনারি কোড' অর্থাৎ কম্পিউটারের ভাষা ব্যবহৃত হয় তার জন্য শূণ্য প্রয়োজন যা আনুমানকি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন এছাড়াও তিনি 'পাই (pi)'-এর নির্ণয় করেন।

এরপরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আসেন ভারতীয় চিকিৎসার দুই রত্নসম চিকিৎসক চরক ও সুশ্রুত। চরক ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পণ্ডিত ও অপরদিকে সুশ্রুত ছিলেন শল্য চিকিৎসক। তিনি খ্যাতি লাভ করেন 'Father of Plastic Surgery' বা 'শল্য চিকিৎসার জনক' রূপে। আরও পরে ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস ১৯০১ সালে তাঁরই আবিষ্কৃত 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমান দেন, যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে ও তারাও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। ১৮৯৫ সালে প্রথমবার কলকাতায় বেতার তরঙ্গের প্রদর্শন করেন। বর্তমান মহাকাশ গবেষণাতেও ভারত আজ অগ্রগণ্য। আর্যভট্টর থেকে আসা সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ও পৃথিবীর তার নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘোরার ধারণা পাই। এরপর ভারতের একমাত্র মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'ইসরো' ১৬১৯ সালে ড. বিক্রম আম্বালা সারাভাই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকে উৎক্ষেপিত হওয়া 'চন্দ্রযান-৩'-এর সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ, বিশ্বে প্রথম মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে মাত্র প্রথম চেষ্টায় প্রবেশের মতো কৃতিত্ব অর্জন করে, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাননীয় এ.পি.জে আব্দুল কালাম পরিচিত ছিলেন 'মিসাইল ম্যান' রূপে। তিনি 'অগ্নি', 'পৃথিবী' প্রভৃতি ক্ষেপনাস্ত্র তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পোখরানে পারমানবিক বিস্ফোরণে তিনি ছিনে কান্ডারী যার সফল পরীক্ষার ফলে ভারত আজ পারমানবিক শক্তিধর দেশ।

এছাড়াও বহু বিজ্ঞানী যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, রামানুজন প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য।

তবে এভাবেই ভারতবর্ষে বহু যুগ থেকেই বিজ্ঞান চর্চা ও তার ব্যবহার বা প্রয়োগ চলছে। বর্তমানে সারা বিশ্বেই একে স্বীকার করেছে। তাই আজ ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানের শক্তিধর দেশ বললে ভুল হবে না।

হায়রে রাজনীতি

আনন্দ মল্লিক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

সকাল বেলা শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার চোখে পড়লো এক বিস্তীর্ণ বিল্ডিং। নামটা শুনেই মনে হলো – 'গণতন্ত্রের মন্দির'। কিন্তু ভিতরের অবস্থা দেখে ভয়ের সঙ্গে হতাশাও লাগলো। এখানে প্রায় সবকিছুই ঘুরে বেড়ায় রাজনীতির চক্রের চারপাশে।

বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে আমাদের দেশের রাজনীতি – সব কিছুই যেন এখানে প্রতিফলিত। খবরের কাগজে লেখা আছে যুদ্ধ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা, পরিবেশ সংকট, কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় বিষয়গুলো আমাদের দেশের সংসদে বা স্থানীয় রাজনৈতিক সভায় কিছুতেই আসে না। বরং স্থান পায় ব্যবসা কেন্দ্রিক রাজনীতি, ধর্ম কেন্দ্রিক রাজনীতি, আর চাকরি কেন্দ্রিক রাজনীতি। বড় ব্যবসায়ীরা চাইলে যে কোনো নীতি পাস করাতে পারে, ধর্মীয় নেতা তাদের প্রভাব বিস্তার করে, আর চাকরিপ্রার্থীরা শুধু নিজের অধিকারের খোঁজে লড়ে।

রাজনীতির এই মঞ্চে মানুষের জীবন কিছুতেই নিরাপদ নয়। কৃষকেরা মরছে দুর্নীতির কারণে, করের বোঝা দিন দিন বাড়ছে। পড়েগা ভারত তো বাড়েগা ভারত কিন্তু শিক্ষার জিনিসপত্রেই 18% GST দিতে হয়। মানুষ আশা করে সরকারি চিকিৎসা, কিন্তু সেখানে সাধারণ সুবিধাটুকু পাওয়াও দুস্কর। 18% GST দিয়ে মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা যেন শেষমেশ রাজনীতির তাবড় বিলাসী জীবন পূর্ণ করে। মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী – তাদের কোটি কোটি টাকা, বিলাসী জীবন, বড় বড় গাড়ি, ছুটির ভ্রমণ – সবকিছুই প্রকাশ্যে। আর সাধারণ মানুষ ? তারা শুধু ভোট দিয়ে তাদের বিশ্বাসে ভর করে, ফলাফলের তফাৎ বুঝতেই পারে না।

এখানেই আসে হায়রে রাজনীতি – মন্ত্রীরা নিজেদের সুবিধার জন্য রাজনীতি চালাচ্ছে, জনগণ ভোট দিয়ে মনে করছে তারা গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যহত করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, নিয়ম মানার মধ্যেই গণতন্ত্রের শক্তি লুকিয়ে আছে, আর অনুসরণ করতে না পারলে আমরা শুধু দেখতে থাকি – রাজনীতি চলছে, কিন্তু ন্যায় ও নীতি কোথায় ?

গোরু চুরি, কয়লার চুরি, শিক্ষার দুর্নীতি – সবই ছোটখাটো ঘটনাগুলো দেখায়, কিভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষদের আচরণ সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে। যুদ্ধ, দাঙ্গা, খুন সবই তখন রাজনৈতিক সুবিধার অংশ হয়ে যায়। এভাবেই চলতে থাকে এক চক্র, যা ব্যক্তির নয়, সামগ্রিক সমাজের ক্ষতি করে।

এই গল্পের শেষে একটি মাত্র কথা মনে আসে, 'হায়রে রাজনীতি!'। আমরা ভোট দিই, আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে। কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ রাখতে হবে। ন্যায়, শিক্ষা, কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার, করের সঠিক ব্যবহার – এগুলো না দেখলে গণতন্ত্র কেবল নামমাত্রই থাকে।

চিত্রকলা ও আলোকচিত্র

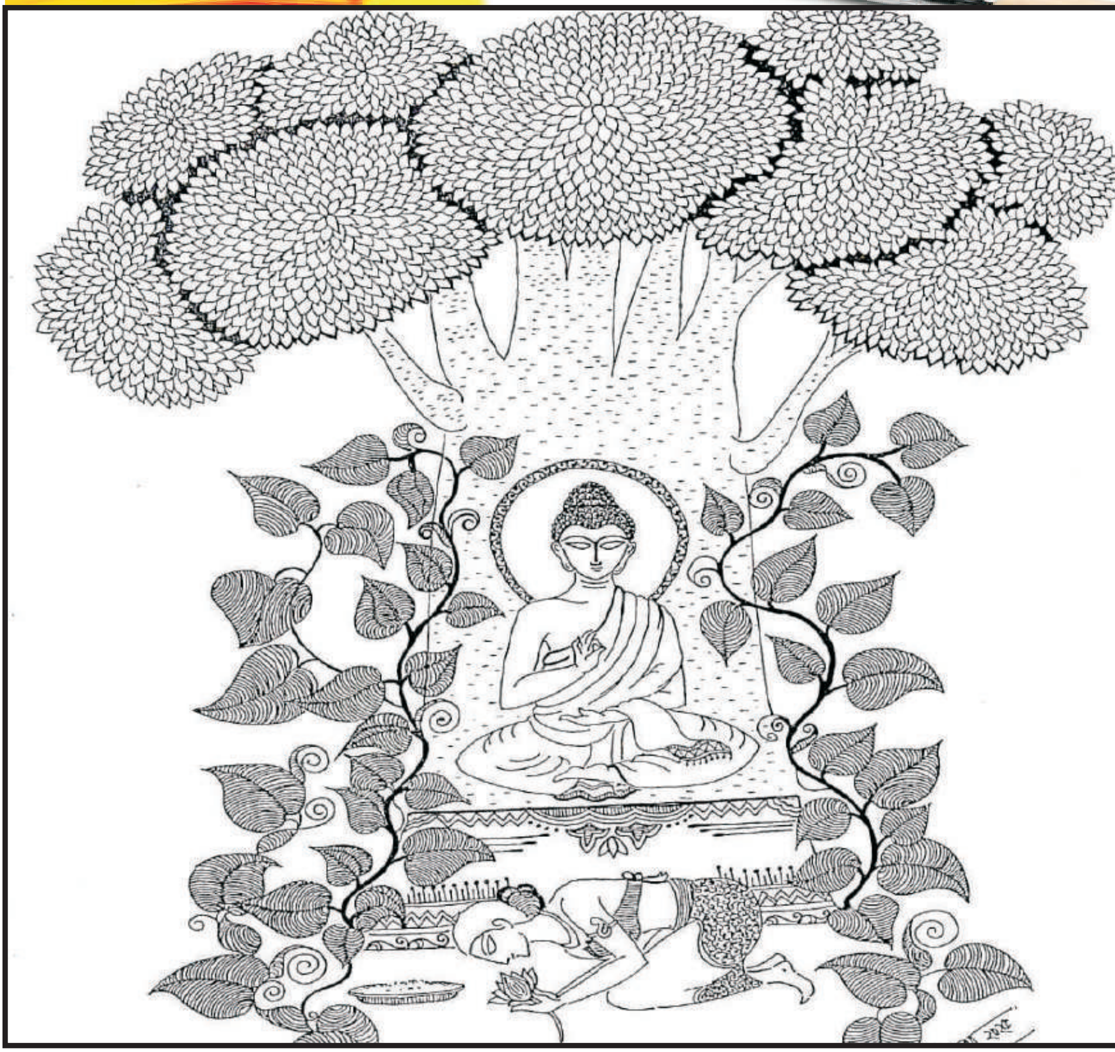

সুজাতা ভৌমিক, অধ্যাপিকা, পুষ্টি বিভাগ

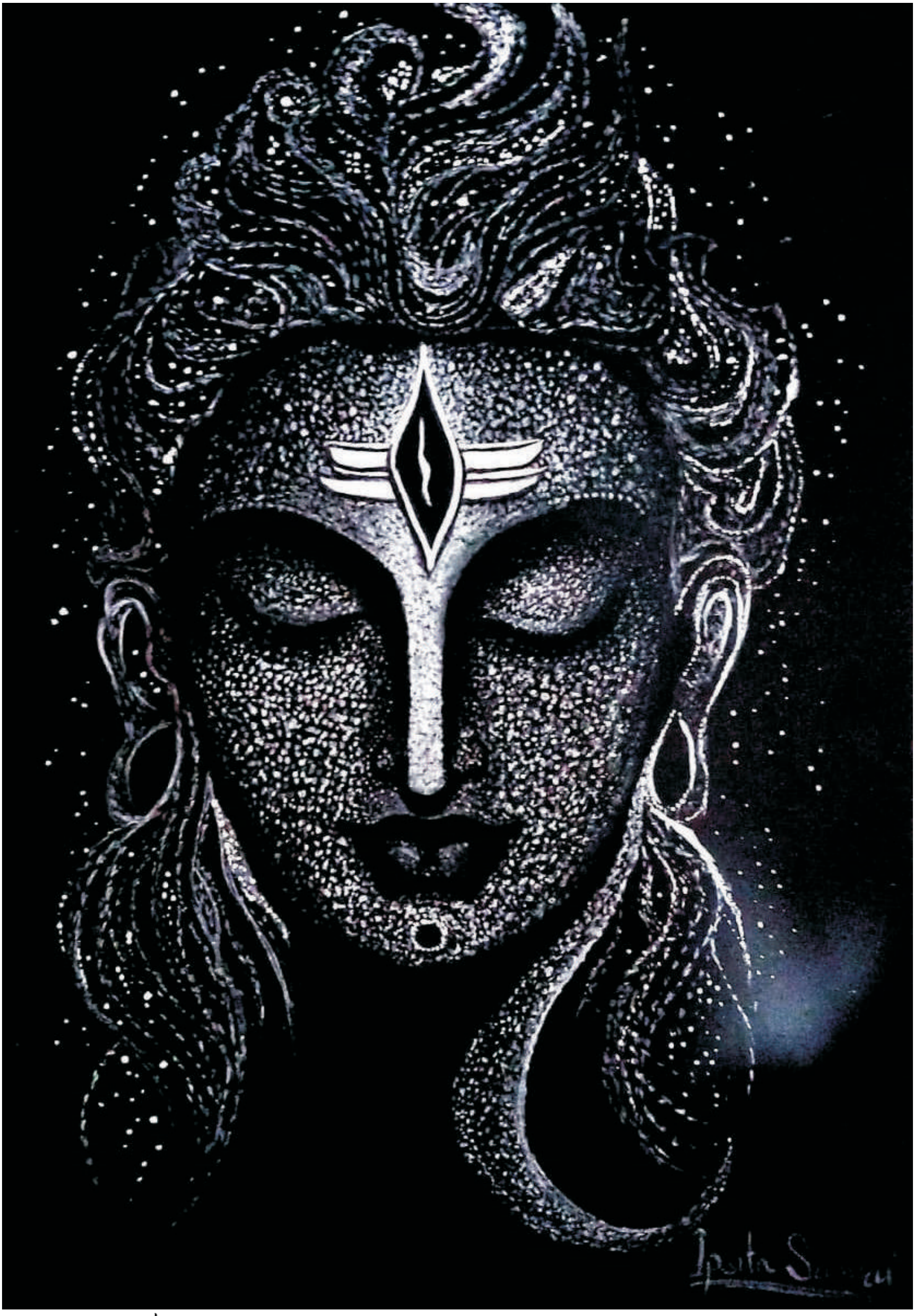

ঈপ্সিতা সামুই, বি.এম.এল,টি, তৃতীয় সেমিস্টার

দিশা মোদক, বি.এম.এল.টি., তৃতীয় সেমিস্টার

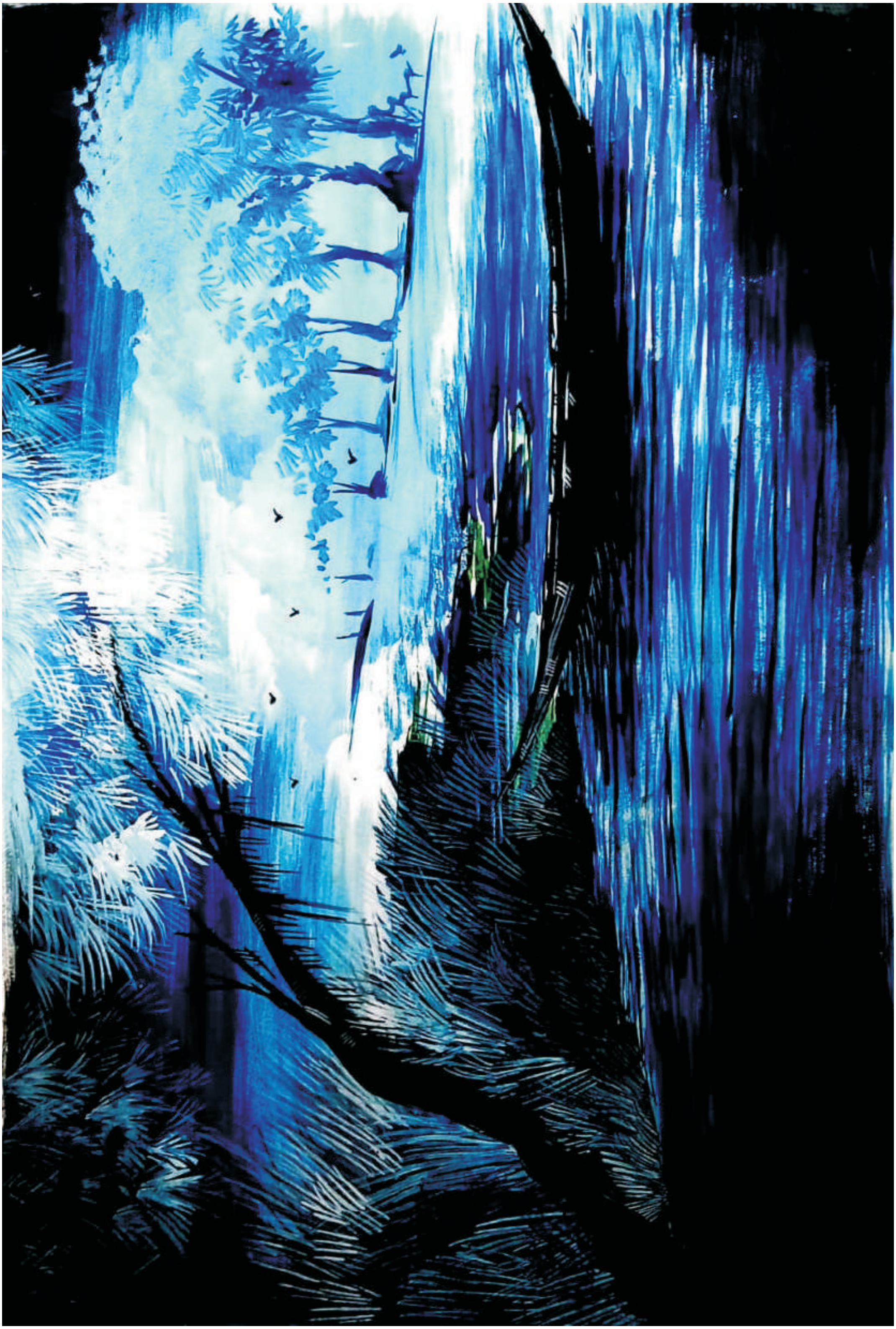

বর্ষণ কোটাল, প্রথম সেমিস্টার, জুলজি বিভাগ

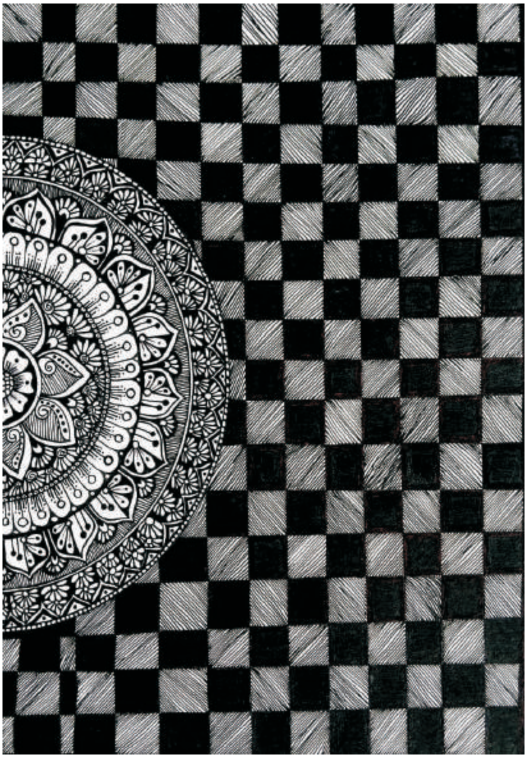

হানিফা খাতুন, ইংরেজি অনার্স

সত্যজিৎ মুর্মু, তৃতীয় বর্ষ. জেনারেল

অদিতি মণ্ডল, প্রথম সেমিস্টার, ইংরেজি অনার্স

কৃষ্ণেন্দু সিং, প্রথম সেমিস্টার

সৌমেন হাইত, বি.এ জেনারেল

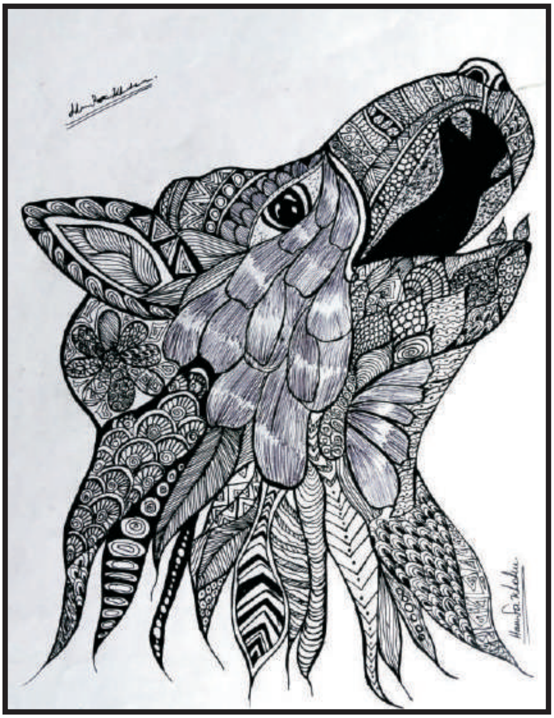

হানিফা খাতুন, ইংরেজি অনার্স

পুজা চন্দ, তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

মুজাহিদ চৌধুরী, প্রথম সেমিস্টার, দর্শন বিভাগ

শ্রেয়া ধল, তৃতীয় সেমিস্টার, ইংরেজি

সৌমেন হাইত, বি.এ জেনারেল

Prof(Dr.) Dipak Kumar Kar, Hon'ble Vice Chancellor visiting our college

Joydeep Mukhopadhyay, Hon'ble Sr. Special Secretary, Higher Education Department and Dr. Madhumita Manna, Hon'ble DPI, Education Directorate visiting our college

চলোর্মি

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

১৭ তম সংখ্যা ২০২৫

NAAC Re-accredited ‘A’ Grade College

ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

(স্বশাসিত)